বঙ্কিম-পরিচয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৮

বঙ্কিম-পরিচয়

বঙ্কিম-পরিচয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৮

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

চুয়াল্লিশ বৎসর হইল, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-মাতার অঙ্ক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। অনন্ত কালস্রোতের বক্ষে এই চুয়াল্লিশ বৎসর সময়কে সামান্য জল-বুদ্বুদ-স্বরূপ মনে করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়া গিয়াছেন—"বৎসরে কি কালের মাপ? ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।"

বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য আমাদের যে অভাব-বোধ—তাহার পরিমাপ বৎসর-গণনার দ্বারা নিরূপিত হয় না। তাঁহার 'প্রতিভা-উৎসের ভাব-প্রবাহিণী হইতে বাঙ্গালী যে নূতন জীবন-রস প্রাপ্ত' হইয়াছে, এ কথা কখনও ভুলিবার নহে। তাই আজ মনে হইতেছে, যেন কত চুয়াল্লিশ বৎসর গত হইল, বঙ্কিম-চন্দ্রকে আমরা হারাইয়াছি। তাই আজ তাঁহার শততম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে বাঙ্গালার বহু স্থানেই তাঁহার স্মৃতি-পূজার উৎসব-আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে।

যে সাহিত্য মানুষ গড়ে, সেই সাহিত্যই তিনি গড়িয়া গিয়াছেন। "স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম

বলা উচিত”—ইহাই ছিল তাঁহার মর্ম্মোক্তি। গঙ্গা হিন্দুমাত্রেরই নিকট পরমপূজ্য দেবতাবিশেষ। তাঁহার ‘ইন্দিরা’তেও আছে—“গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী।” কিন্তু দেশের জন্য দুঃখ করিতে গিয়া তিনি সেই গঙ্গার উদ্দেশে নিঃসঙ্কোচেই বলিয়াছেন—“তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়?” সত্য সত্যই দেশ-মাতাকে তিনি সকল দেবতার উপরে আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যে আদর্শ ভাষা, অমূল্য ভাব ও অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পদ্ লাভ করিয়াছি, তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা-প্রসূত হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, সে প্রতিভা তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীতির প্রভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবল স্বদেশানুরাগই যে তাঁহার ‘বঙ্গদর্শনে’র স্রষ্টা, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

‘বঙ্গদর্শন’ বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে ‘বঙ্গদর্শনে’র কথা স্বতঃই স্মরণ-পথে উদিত হয়। ‘বঙ্গদর্শনে’র প্রথম সংখ্যাতেই তিনি ‘ভারত-কলঙ্ক’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে বুঝাইয়া দেন যে, “মধ্যকালে যাহা ভারত-কলঙ্ক বলিয়া মনে ধারণা করিয়াছ, ইতিহাসের সূক্ষ্ম অস্ত্র লইয়া সেই কলঙ্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিবে, তাহাই ভারত-গৌরব।”

'বঙ্গদর্শন' যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স চৌত্রিশ বৎসর মাত্র। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এত অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রে এই উপদেশ-বাণী—"আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও রত্ন-প্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর।"—নানা প্রকারে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর গৌরব। তাঁহার গৌরবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও আজ গর্ব্ব ও গৌরব-প্রকাশের অধিকারী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সর্ব্বপ্রথম এণ্ট্রান্স্ ও বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়, তখন এই উভয় পরীক্ষারই উত্তীর্ণ ছাত্র-তালিকায় তাঁহার নাম আমরা দেখিতে পাই। তারপর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া যতকাল তিনি জীবিত ছিলেন, ততকাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য-পদে নিযুক্ত থাকিয়া ইহার কল্যাণ-সাধনের জন্য যত্ন ও শ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার তৈলচিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্ষে সাদরে স্থাপিত রহিয়াছে। তাই তাঁহার শততম বার্ষিকী-উপলক্ষে বাঙ্গালার ছাত্র-সম্প্রদায়কে উপহার দিবার উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আজ এই 'বঙ্কিম-পরিচয়'

প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া ছাত্রগণের পাঠোপযোগী বচনামৃত ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিতেন—"কবিতা দর্পণমাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে।" তাঁহার রচনা 'কবিতা' না হইলেও সে রচনার ভিতর তাঁহার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার যুবক-সম্প্রদায় যদি এই পুস্তক-মধ্যে তাঁহার ছায়া দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই উদ্যম ও উদ্দেশ্য সার্থক হইল, বিবেচনা করিব।

এই পুস্তক-সঙ্কলনের ভার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

২০এ জুন, ১৯৩৮
সেনেট হাউস,
কলিকাতা

বঙ্কিমচন্দ্র (জীবন-কথা)

বন্দে মাতরম্

বাঙ্গালীর উদ্দেশে

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

ধর্ম্ম ও সমাজ

নানা কথা

বর্ণনা

পরিশিষ্ট

বঙ্কিমচন্দ্র

জীবন-কথা

১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮, ২৭এ জুন) কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই গ্রাম জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত, গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত ; ইহার অপর পারে চুঁচুড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চারি পুত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার তৃতীয় পুত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কোনও পাঠশালায় পড়েন নাই। তাঁহার বাল্যশিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। পিতৃদেব তখন ঐ স্থানে ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন।

শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র এক দিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাশ-পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময় তাঁহার যে একবেলার মধ্যে বর্ণ-পরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। টিড্ সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন, এবং পরে তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।”

ইহার পর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র যখন মেদিনীপুর হইতে চব্বিশ পরগনায় বদ্‌লি হন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হয়, এবং সেখানে থাকিয়া হুগলি-কলেজে তিনি পড়িতে আরম্ভ করেন। হুগলি-কলেজে পড়িবার সময়েই ভাটপাড়ার বিখ্যাত বৈয়াকরণ ৺শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ পদ্য লিখিতেও তিনি এই সময়ে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বর গুপ্তের

কথা বলিতে গিয়া তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—“আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।”

সাধারণতঃ দেখা যায়, ছাত্রাবস্থায় কাহারও রচনার দিকে বিশেষ মনোযোগ থাকিলে পড়া-শুনার প্রতি তাহার তেমন দৃষ্টি থাকে না। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ‘ছেলেদের সতর্ক’ করিবার উদ্দেশ্যে নিজে লিখিয়াও গিয়াছেন—“লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই অমনি পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক্ নষ্ট হয়—রচনা-শক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়।” কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ‘ললিতা’ ও ‘মানস’ নামে দুইখানি পদ্য-পুস্তক “পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়।” অথচ ইহার ঠিক এক বৎসর পরেই অর্থাৎ, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন, এবং তাহাতেও সকলের উপরে হন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং এই বৎসরের এপ্রিল মাসে প্রথম এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা গৃহীত হয়। ২৪৪ জন ছাত্রের মধ্যে ১৫ জন পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং ১১৫ জন প্রথম বিভাগে ও ৪৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বলা বাহুল্য, এই পরীক্ষারও প্রথম বিভাগের তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িবার সময়ে তিনি এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় বাঙ্গালা বিষয়ে পাঠ্য ছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ। পরীক্ষক ছিলেন—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ সময়ে এফ্. এ. পরীক্ষা ছিল না; ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উহার প্রবর্ত্তন হয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে আর ঐ পরীক্ষা দিতে হয় নাই। এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা পাস করিবার পর বৎসরেই, অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বি. এ. পরীক্ষা যখন গৃহীত হয়, তখন সে পরীক্ষায়

যে দুইজন ছাত্র উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের নামই প্রথম উল্লিখিত হইয়াছিল।

ইহার পরই বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর দুই মাস মাত্র। এ সময়েও তাঁহার লেখনী বন্ধ ছিল না। 'Indian Field' নামে একখানি ইংরেজি পত্রে 'Rajmohan's Wife' নাম দিয়া তিনি একখানি ইংরেজি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। অনেকের মতে, বাঙ্গালা রচনার ন্যায় তাঁহার ইংরেজি রচনাও সরল ও সুমিষ্ট। ইংরেজি ভাষায় তিনি বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি যেমন প্রতিভাশালী ছিলেন, তেমনই পরিশ্রমও করিতে পারিতেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতে করিতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বি. এল্. পরীক্ষা দেন, এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। অথচ এই বৎসরেই তাঁহার 'মৃণালিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'মৃণালিনী'-প্রকাশের দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' এবং তাহারও দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"যখন 'দুর্গেশ-

নন্দিনী' প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল।"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স্ এসোসিয়েশনে বঙ্কিমচন্দ্র একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল—'বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য'। ইহার এক স্থানে তিনি বলেন—"আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী, আমাদের অদ্ভুত বিস্মৃতির প্রভাব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কেবল এই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই বাঙ্গালী জাতিকে আমরা কোনও একটা ভাবে বিচলিত বা উত্তেজিত করিতে পারি। অথচ আমরা ইংরেজি ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করি, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করি, গদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি। তখন আমাদের মনে থাকে না যে, দেশের জনসাধারণ ইংরেজি ভাষাবোধে একেবারেই বধির; তাহারা আমাদের ব্যবহৃত একটি ইংরেজি শব্দেরও অর্থবোধ করিতে পারে না। অথচ সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন একটা নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; নহিলে কোনও ফলোদয় হইবে না। আমার মনে

হয়, একটা বড় ভাবের কথা বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী-দিগকে বুঝাইতে পারিলে, সে ভাব তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে ; হৃদয়ে নূতন তরঙ্গের উদ্ভব হইবে, সে তরঙ্গ জনে জনে আঘাত করিয়া দেশব্যাপী একটা বিরাট্ ভাবের ঢেউ তুলিতে পারিবে। এই নবভাবে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, জাতির হৃদয়ে সজীবতা আনয়ন করিবে, সমাজের কল্যাণ আপনিই সাধিত হইবে। অন্য পক্ষে, কেবল ইংরেজি ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিলে, ইংরেজিতে বক্তৃতা করিলে, জাতিব্যাপী বিরাট্ কার্য্যের সূচনা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই হেতু সামাজিক হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে সাহিত্য জাতির সাহিত্য—জনসাধারণের সাহিত্য হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশের বীজ নিহিত আছে। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে অর্থাৎ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ।

ঠিক চারি বৎসর কাল এই মাসিক পত্রের তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই ভাষায় বলা যায়—"এই সময়টিই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকাল-স্বরূপ সমুজ্জ্বল।"

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ আটটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে 'পত্র-সূচনা', 'ভারত-কলঙ্ক', 'বিষবৃক্ষ', 'সঙ্গীত' ও 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল'—এই পাঁচটি রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের। যতদিন তিনি এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন, ততদিন ইহাতে এইরূপ অধিকাংশ রচনাই নিজে লিখিতেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন—"বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে বলিতে পারা যায় ; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ মানুষের অভাব। 'বঙ্গ-দর্শন' বলিয়া দিয়াছিল, বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।"

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যতীত আর এক কীর্ত্তি আছে। সে কীর্ত্তি—সাহিত্যিক-সৃষ্টি। বাঙ্গালার কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক 'বঙ্গ-দর্শনে'র শিক্ষানবীশ ছিলেন। অনেকে 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া বাঙ্গালা লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার জন্যও বঙ্গসাহিত্য 'বঙ্গদর্শনে'র নিকট ঋণী।

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় যথার্থই বলিয়াছেন—“সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্র, যোগেন্দ্র, রমেশ—বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিভার প্রভা। সঞ্জীব বাবু, বঙ্কিম-রবি-প্রতিফলিত চন্দ্রালোক। চন্দ্রনাথ বাবুর ‘শকুন্তলা-তত্ত্ব’, বঙ্কিম বাবুর উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্বোধিত। তাঁহার ‘হিন্দুত্ব’ ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের ব্রাহ্মণত্বে জীবিত। চন্দ্রশেখর বাবুর ‘উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম’, বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্তের দপ্তরের একখানি মাত্র কাগজ পরিবর্দ্ধিত; কমলাকান্তের নানাবিধ স্বরের মধ্যে একটি স্বর মাত্র গীতিপুঞ্জে দীর্ঘীকৃত, কলকণ্ঠে মধুরনাদিত। অক্ষয় বাবু ‘বঙ্গদর্শনে’, ‘নবজীবনে’, ‘সাধারণী’তে বঙ্কিম বাবুর মেধাবী শিষ্য। রবীন্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবুর সহজ চলিত ভাষা আরও সহজ করিয়া লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার আরও সমাবেশ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর কবিত্বময় গদ্য আরও কবিত্বময় করিয়া, সুন্দরে সুন্দর মিশ্রিত করিয়াছেন। রমেশ বাবুর ‘বঙ্গবিজেতা’ বঙ্কিম বাবুর উৎসাহে লিখিত। যোগেন্দ্র বাবুর ‘আর্য্যদর্শন’ ‘বঙ্গদর্শনে’র অনুযাত্রী। আমাদিগের দেশের আরও অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্কিম

তাঁহাদিগের সাহিত্য-জীবনের প্রকৃতি বা জন্মদাতা; তাঁহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি।”

বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ হইতে বিদায়-গ্রহণ করিলে পুনরায় যখন এই পত্র অন্যের সম্পাদনে প্রকাশিত হয়, তখন ‘সাধারণী’ পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—“যখন অকালে ‘বঙ্গদর্শন’ বিদায় গ্রহণ করেন, তখন আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলাম যে, ‘কনিষ্ঠা ভগিনী যেরূপ অজ্ঞাত-বাস-প্রয়াসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুনরাগমন প্রত্যাশা করে, আমরাও আজি সেইরূপ অশ্রুপূর্ণ লোচনে ‘বঙ্গদর্শনে’র পুনর্দর্শনের আশা-পথ চাহিয়া রহিলাম’। সে আশায় আমরা নিরাশ হই নাই; কিন্তু এখনও চক্ষের জল মুছিতে পারিতেছি না। বর্ষেক অজ্ঞাত-বাসের পর বৈরাগ্য বেশ কেন? আমাদের ইচ্ছা হয়—অজ্ঞাতবাসের পর যুধিষ্ঠিরাদি বিরাট-ভবনে যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন, আমরাও ‘বঙ্গদর্শনের’ সম্পাদক ও লেখকগণকে আবার সেই রূপেই দেখিতে পাই। ইচ্ছা হয়—আবার তেমনই করিয়া যুধিষ্ঠির স্বর্ণ সিংহাসনে বিরাজিত থাকেন, তেমনই করিয়া

ভীমার্জ্জুন সশস্ত্র তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়েন, আর তেমনই করিয়া আবার নকুল-সহদেব চামর-হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া জ্যেষ্ঠের সেবা করেন ; কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, আমরা বুঝি 'বঙ্গদর্শনে'র কখন সে রাজ-বীর-মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইব না। যে 'বঙ্গদর্শন' আত্মগৌরবে ভর করিয়া, যুবার উৎসাহপূর্ণ বেশে, অশ্বারোহণে, কশাহস্তে, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে এই রণ-ভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন, সে 'বঙ্গদর্শনে'র সর্ব্বালঙ্কার-পরিভ্রষ্ট তপস্বিবেশ সেই রণভূমিতে আমরা অক্ষুব্ধ-হৃদয়ে দেখিতে পারি না। আমরা এখনও চোখের জল মুছিতে পারিলাম না।"

'বঙ্গদর্শন' হইতে বিদায়-গ্রহণের পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার লেখনীকে কিছুকাল বিশ্রাম দেন। কিন্তু লেখনীকে বিশ্রাম দিলেও নিজে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র-অধ্যয়নে তিনি বিশেষরূপ যত্নশীল হন। তাঁহার 'গুরু-শিষ্যের কথোপ-কথনে' আছে—"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?'—সমস্ত জীবন

ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি। অনেক পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। জীবনের সার্থকতা-সম্পাদন-জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।"— এই 'প্রাণপাত পরিশ্রম' তাঁহাকে বোধ হয় জীবনের এই সময়েই করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র-অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার নিকটও ধর্ম্মশিক্ষা করিতেন। তিনি তখন হুগলির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার সম্বন্ধে তখনকার কথা তাঁহার অনুজ পূর্ণবাবু এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন— "তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন।...... কোনও ধর্ম্ম-প্রচারকের নিকট তিনি হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা পান নাই। তাঁহার একমাত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব। 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—'যাঁহার কাছে নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছি, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্রত করিয়াছিলেন—'

ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়ায় থাকা কালেই পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরেই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর যাহা লিখিতেন, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন।...... ১৮৮১ সালে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। উহার মাস কয়েক পরে সঞ্জীবচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' 'আনন্দ-মঠ' প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮২ সালে 'Statesman' সংবাদপত্রে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া Rev. Dr. Hastie সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মসীযুদ্ধ হয়। ১৮৮৩ সালে 'বঙ্গদর্শনে' 'দেবী চৌধুরাণী' বাহির হয়। ১৮৮৪ সালে 'নবজীবনে'র প্রথম সংখ্যায় 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ আরম্ভ হয়। ঐ সনের শ্রাবণের 'প্রচারে' প্রথম সংখ্যায় 'সীতারাম' বাহির হয়।"

'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইলে 'সাধারণী' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—"বিগত বৎসরের প্রধান কাব্য—'আনন্দমঠ'। সংকল্প-সাধনায় আনন্দমঠ বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আর 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমবাবুর হৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচায়ক।......বঙ্কিমবাবুর দেশভক্তি প্রখরা, প্রোজ্জ্বলা, স্থিরা এবং গম্ভীরা। হেমচন্দ্রে

('মৃণালিনী'র) ইহার অভিব্যক্তি, প্রতাপে প্রতিঘাতের পর বলসঞ্চয়, আনন্দমঠের সন্তানগণে সেই বলের বিকাশ। আনন্দমঠে দস্যুর অর্থলোভ, মোহমুগ্ধের রূপতৃষ্ণা, দম্পতীর পবিত্র প্রণয়, বাল্যসখার চিরবন্ধুত্ব, দুরাকাঙ্ক্ষীর উচ্চ আশা এবং উদাসীনের পরকাল-চিন্তা —সমস্তই দেশভক্তির প্রবল স্রোতে প্লাবিত হইয়াছে। একমাত্র দেশভক্তিই বাঙ্গালীর যে পরা গতি, পরা মুক্তি —তাহা এ পর্য্যন্ত কাব্যের উজ্জ্বল চিত্রে চিত্রিত করিয়া কেহ বাঙ্গালীকে দেখায় নাই। বঙ্গে বাঙ্গালীর ভক্তি— কাশীদাসে নাই, কৃত্তিবাসে নাই, ভারতে নাই, রাম-প্রসাদে নাই; সেকস্পীয়র বা শীলারে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর সম্মুখে এই গরীয়সী দেশভক্তি চিত্রিত করিয়াছেন। সেই জন্য বলিয়াছি, সংকল্প-সাধনায় 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট গ্রন্থ এবং তাঁহার হৃদয়ের উৎকৃষ্ট পরিচায়ক।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন আটচল্লিশ বৎসর, তখন তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, এবং সেই সময়ে 'প্রচারে' তিনি গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি

লিখিয়াছেন—"আমার দুরাকাঙ্ক্ষা যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই আমি ইউরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্য লিখিব।" বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্যই তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্ব' লিখিয়াছিলেন এবং গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে, সে ব্যাখ্যা তিনি আর শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এই অবসর-প্রাপ্ত জীবনে—'জীবন লইয়া কি করিবেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধানে তিনি যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নানা ভাবে শুনাইয়া যাইবেন। তিনি জানিয়াছিলেন,

"ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত, তাহার মোহিনী মূৰ্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কিছুই" নাই ; এবং সেই জন্য বলিয়াছিলেন—"তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে" না। কিন্তু ঐ ত্রিমূৰ্ত্তির প্রাণ ভরিয়া পরিচর্য্যা করিবার পূর্ব্বেই নিষ্ঠুর কাল আসিয়া অকালে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে 'Vedic Literature' নামে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ তিনি 'ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিটিউটে' পাঠ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু বলিবার আর অবসর পাইলেন না। ১৩০০ সালের ২৩এ চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল, ১৮৯৪) বেলা ৩টা ২৩ মিনিটের সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং,

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং,

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং

রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্;
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্॥

বাঙ্গালীর উদ্দেশে

বাঙ্গালীর উদ্দেশে

১

সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশ-প্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।

ধর্ম্মতত্ত্ব

২

গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে? যে মনুষ্য জননীকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য মনুষ্য-মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতি-মধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি বলিয়া রোদন করিলাম।

"Three years in Europe" গ্রন্থের
সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, ১২৭৯

৩

এদেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমূলফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না।······যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্রমাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু ফল ফট্‌ করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে।

কমলাকান্তের দপ্তর

৪

নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়।

বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা

৫

যিনি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না।

সম্পাদকীয় মন্তব্য—বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৬

যতদূর ইংরেজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরেজ হইতে পারিবে না।……আমরা যত ইংরেজি পড়ি, যত ইংরেজি কহি, বা যত ইংরেজি লিখি না কেন, ইংরেজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব।

বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা

৭

এ দেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে; ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল
—বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৮

এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ······ যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়?

বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা

৯

কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা

নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল-কারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিন-যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এদেশে সার্ অস্লি ইডেন, ইহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি যাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি যাটি লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না, বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

লোকশিক্ষা

১০

যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা

১১

বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে এক্ষণে পৃথক্, পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দূ-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮০

১২

সুখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালীর মর্ম্মোক্তি।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৩

যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।

বঙ্গদেশের কৃষক

১৪

যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য-রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে।······বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১৫

মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল; চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

বাঙ্গালার কলঙ্ক

১৬

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়। তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মা'র গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১৭

বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলী-মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন-বার্ত্তা ত শুনিলাম না।

বিজ্ঞাপন—বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ

১৮

মনুষ্যের স্বভাবই এমত নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয়।……আমরা প্রাচীন জাতি; অদ্যাপি মহাভারত-রামায়ণ পড়ি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা-অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর-আরাধনা করি। যতদিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না।……যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্বগৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই।……

যতদিন জাতি-বৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে।

জাতিবৈর—সাধারণী, ১২৮০

১৯

তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি—আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না। ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই।

রজনী

২০

আমরা সর্ব্বদাই মনে করি যে, এক্ষণকার ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বাঙ্গালী চিকিৎসকেরা

যদি আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তবে কিছু উপকার হইতে পারে। প্রথম উপকার, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বিজ্ঞান-পারদর্শিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় উপকার, প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই কি ? বলিতে পারি না ; আমরা বিশেষজ্ঞ নহি। তবে দেখিতেছি, দেশী চিকিৎসা অদ্যাপি বিলাতী চিকিৎসার প্রতিযোগিনী হইয়া প্রচলিত আছে। বিলাতী চিকিৎসার প্রচার সত্ত্বেও দেশী চিকিৎসার মান আজিও বজায় আছে—কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিত ?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮১

২১

ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি-সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর

বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই।

বিজ্ঞাপন—রাজসিংহ

২২

বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যায়াম-শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধির অভাব নাই; বল ও সাহস হইলেই আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বল হইলেই সাহস হইবে। বলের পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্যায়াম-শিক্ষার পক্ষে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮০

২৩

যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ

স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীত-বিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্ত্তব্য।

সঙ্গীত

২৪

ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটির' উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ-সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি।

কমলাকান্তের দপ্তর

২৫

আত্ম-নিন্দায় দোষ নাই—উপকার আছে। আমরা বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর নিন্দা করিতে অধিকারী—নিন্দার একটু অন্যায় আতিশয্য হইলেও লাভ আছে। আমাদিগের যে অবস্থা, তাহাতে আপনা-আপনি

ধন্যবাদ আরম্ভ করার অপেক্ষা অমঙ্গলকর আর কিছুই হইতে পারে না।

'সেকাল আর একাল' গ্রন্থের সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮১

২৬

অশ্লীলতা পাপাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ। যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে শুধু কাষ্ঠে অগ্ন্যুৎপাত হয় না; কিন্তু যেখানে অগ্নি আছে, সেখানে কাষ্ঠে তাহা জ্বালিত, বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বগ্রাসিত অবস্থায় পরিণত হয়।

অশ্লীলতা—বঙ্গদর্শন, ১২৮০

২৭

বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে,

কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়-শোণিত পান করা দয়ার কাজ।

বঙ্গদেশের কৃষক

২৮

বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না।

কপালকুণ্ডলা

২৯

একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু সংগ্রহ করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ।

কমলাকান্তের দপ্তর

৩০

বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

৩১

গোরু হইতে বাঙ্গালী কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালীও সেইরূপ। ইহারা সংবাদপত্র-রূপ ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে, চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবন-ক্ষেত্র কর্ষণপূর্ব্বক ইংরেজ-চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে, বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কলেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে, সমাজ-সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে, এবং দেশহিতের ঘানি গাছে স্বার্থ-সর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তেল বাহির করিতেছে।

অনুকরণ

৩২

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলে। গুণের মধ্যে

কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল ; তবে এক গুণ মানি, ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল।

কমলাকান্তের দপ্তর

৩৩

বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য ; এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণ-ভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষ-ভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালী গুণের অনুকরণে তত পটু নহে, দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালীর অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি।

অনুকরণ

৩৪

আমাদের ইচ্ছা আমাদের পলিটিক্‌স্—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্‌স্ ; কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুত গমনের আকাঙ্ক্ষার মত,

অন্ধের চিত্রদর্শন লালসার মত,·········ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্‌স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুর-বাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহীমাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্‌স্‌ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদিগের পলিটিক্‌স্‌। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্‌স্‌ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

কমলাকান্তের দপ্তর

৩৫

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও, রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া

স্বীকার করিতে হইবে ? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে ? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না ? ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—

বঙ্গদর্শন, ১২৮০

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

৩৬

বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত।

বাঙ্গালা ভাষা

৩৭

বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা ; কুল-লক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই এঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মারহাট্টি প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

৩৮

যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং

লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন।

বাঙ্গালা ভাষা

৩৯

বাঙ্গালা ভাষায় এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান

৪০

রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।

বাঙ্গালা ভাষা

৪১

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

৪২

যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দ-পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই এক জনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞান-বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়ণের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত--ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে

তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

বাঙ্গালা ভাষা

৪৩

গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান

৪৪

কতকগুলা শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাঁহাকে শব্দ-চতুর বলি না, অথবা যিনি শ্রুতিমধুর শব্দ-প্রয়োগে দক্ষ, তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে, একটি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দ-দায়ক পদার্থ স্মরণ পথে আইসে।

'অবকাশ রঞ্জিনী'র সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, ১২৮০

৪৫

এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না, বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা

যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে।

ঈশ্বরগুপ্তের জীবনী

৪৬

সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

৪৭

কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকার-কর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিকশক্তিসম্পন্ন।

উত্তরচরিত

৪৮

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উত্তরচরিত

৪৯

কি এদেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্যকাব্য বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন-প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

উত্তরচরিত

৫০

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতি-জ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি-বিধান করেন।

উত্তরচরিত

৫১

সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম এবং সাহিত্য

৫২

যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্য-জাতির শত্রু, এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব

৫৩

কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্য-হৃদয়ের অংশ অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে।

প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত

৫৪

রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি।

এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন—জগতে অতুল্য কাব্য-গ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত 'Paradise Lost'। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ আণ্টনি-ক্লিওপেত্রা। রূপ-বহ্নির রোমিও ও জুলিয়েট। ঈর্ষ্যা-বহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহ-জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।

কমলাকান্তের দপ্তর

৫৫

প্রকৃত আদিরস জগতের একটি দুর্লভ পদার্থ। ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এই আদিরস চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজিতে নানাস্থানে চমৎকার আদিরস পাওয়া যায়। অন্ধকবি মিণ্টন যখন ইদন উদ্যান-মধ্যে প্রথম নর-দম্পতীকে সৃজন করিয়া, মনোহর গন্ধবাহী প্রভাতকালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাতে কি অপূর্ব্ব আদিরস সংঘটিত

হইয়াছে। সরলা নিষ্পাপা লোকমাতা নিদ্রা যাইতেছেন, আদি পুরুষ……তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অলকাবলীর উপরি প্রভাত-সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকাবলী ঝলমল করিতেছে, আদম যতনে তাহা সরাইয়া দিতেছেন; এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য, অমূল্য। কিন্তু এই অপূর্ব্ব রসের বিকৃতি আছে; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে। একটা সামান্য কথায় বলে যে, মন্দ দ্রব্য কোনরূপে সেবন করা যায়, কিন্তু ভাল দ্রব্য মন্দ হইলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়। ঘোল খাওয়া যায়, কিন্তু দুধ ছিঁড়িয়া গেলে, তাহা আর কাহার সাধ্য যে গলাধঃকরণ করে? আদিরস সম্বন্ধেও সেইরূপ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৫৬

এমন অনেক কাব্য আছে যে, তাহার অশ্লীলতায় অপবিত্রতার ছায়াও নাই। এমন অনেক কাব্য আছে যে, তাহা অশ্লীলতা-দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্য-বুদ্ধি-সৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়।

কোন কোন স্থানে অশ্লীলতা কাব্যের উৎকর্ষ-পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যিনি এ কথা হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না, তিনি দুর্য্যোধনের সভায় দ্রৌপদীর কথা মহাভারতে পাঠ করিবেন। ইহাও আমরা স্বীকার করি, যাহার চরিত্র বিশুদ্ধ, অশ্লীলতা তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। .... এ সকল স্বীকার করিলেও অশ্লীলতা সমাজের বিশেষ অনিষ্টকর অবশ্য বলিব। ইহার একটি ভয়ানক ফল এই যে, ইহা বিশুদ্ধ চরিত্রের কোন অনিষ্ট না করুক, পাপাসক্তের পাপস্রোত বৃদ্ধি করে।

অশ্লীলতা—বঙ্গদর্শন, ১২৮০

৫৭

অশ্লীলতা-দোষের উচ্ছেদকরণ জন্য অশ্লীল শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক বিদ্রূপ করিলে কেহই কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না; তাহাতে অশ্লীলতার বৃদ্ধি ভিন্ন আর হ্রাস হইবে না।

'নয়শো রুপেয়া'র সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮০

৫৮

দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি।……আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি ……বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা-অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মঁস্যুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমরা অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

ঈশ্বরগুপ্তের জীবনী

৫৯

কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানা প্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন, সামাজিক বলের অধীন, এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবিমাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ-গুণ আছে, যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাঁহাদিগের জাতীয় দোষ-গুণ। প্রাচীন কবিমাত্রেরই কতকগুলি দোষ-গুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেই গুলি তাঁহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবিমাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র্য আছে। সেগুলি তাঁহাদিগের নিজ-গুণ। অতএব, কাব্য-বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য।

কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৬০

আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যেই সুখ। অনুকরণে এই

সুখের ধ্বংস হয়। ম্যাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক ম্যাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

অনুকরণ

৬১

'নকল' শুনিয়াই কেহ ঘৃণা করিবেন না; অনুকরণ হইলেই গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় না। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। বর্জ্জিলের মহাকাব্য যে ইলিয়দের অনুকরণ, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। স্বয়ং সেক্ষপীয়রও অনেক সময়ে, নিকৃষ্টতর কবিদিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আপন অপূর্ব্ব নাটকসকল রচনা করিয়াছিলেন। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, অনুকৃতের অপেক্ষা অনুকারী প্রতিভাশালী।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৬২

প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, সে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল, এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে, এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্ম্মনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন যে শেষোক্ত জাতি সকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল।

অনুকরণ

৬৩

কোন জাতি নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, সেই জাতির সাহিত্য প্রায় দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অনুবাদ, আর এক অনুকরণ। কদাচিৎ দুই একজন,

স্ববুদ্ধি-মূলক অভিনব সাহিত্য রচনায় সক্ষম হয়েন। আরব জাতীয়েরা অনুবাদ ভিন্ন প্রায় আর কিছুই করিতে পারেন নাই। রোমক সাহিত্য যুনানী সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেন; মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সুকবিরা অনুকরণ করেন। মেঘনাদ বধ ইলিয়দের অনুকরণ, নবীন তপস্বিনী 'Merry Wives of Windsor' নামক নাটকের অনুকরণ। কিন্তু অনেক সময়ে অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সুসাধ্য, এবং সাধারণের উপকারী হয়। অনুকরণ দুই-একজন বিশেষ প্রতিভাশালী লেখকের হস্তেই ভাল হইয়া থাকে; ভাল হইলেও, উপকারিতায় সকল সময়ে অনুবাদের তুল্য হয় না।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৬৪

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ দেশে একদল নব্য মূর্খ জন্মিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে ক্ষণিক মনোরঞ্জন

ভিন্ন কাব্যে আর কোন উপকার নাই, এবং বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যা অনুশীলনের যোগ্য নহে। যদি এই মূর্খদিগের বিজ্ঞানে কিছুমাত্র অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অধিক আদর কর্ত্তব্য বটে, কেন না বিজ্ঞান কিছুই নাই, কাব্যের তাদৃশ অভাব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যে হতাদর হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

নানা কথা—বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৬৫

যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ-সংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

উত্তরচরিত

৬৬

গ্রন্থারম্ভে ('বাল্মীকির জয়ে'র) হিমালয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে।···ঐ বর্ণনা পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয়-বর্ণনা আজিও সাহিত্য-সাগরে অতুল, তাহা স্মরণ কর। দেখিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ! কুমারসম্ভবের কবি, জগতের কবিকুলের আদর্শ—অতি-প্রকৃত সৌন্দর্য্যের (Ideal) অবতারণায় অদ্বিতীয়, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু আধুনিক কবি প্রকৃতের (Real) বর্ণনায় কি সুচতুর! ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি। আমাদের চির মার্জ্জিত পবিত্র অতিপ্রকৃত চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, আমরা ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া, পার্থিব অপবিত্র প্রকৃত চরিত্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা। নীচশিক্ষা কাহাকে বলিব?

'বাল্মীকির জয়ে'র সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮৮

৬৭

গল্পোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্য-চরিত্র। মনুষ্য-চরিত্র

ঘোরতর বৈচিত্র্যবিশিষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষ্য স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য পশুবৃত্ত এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট; এমন কেহ নাই যে, সে একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে, সে একান্ত স্বার্থবিস্মৃত পরহিতানুরক্ত; কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে আছে; তবে সর্ব্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্‌গুণের ভাগই অধিক, অসদ্‌গুণের ভাগ অল্প, সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি; যাহার সদ্‌গুণের ভাগ অল্প, অসদ্‌গুণের ভাগ অধিক, তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্য-চরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক; দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্য-হৃদয় বিভক্ত। কাব্যের বিষয় মনুষ্য-চরিত্র; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিম্বিত হইবে। কি গদ্য, কি পদ্য, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ মাত্রই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত।

'কল্পতরু'র সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৬৮

মনুষ্য-হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও তদ্রূপ। রাবণ ব্যতীত রামায়ণ হইত না। দুর্য্যোধন ব্যতীত মহাভারত হইত না। কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কোন্ ভাগ বর্জ্জনীয়, কোন্ ভাগ অবলম্বনীয়, তাহা যিনি বুঝিতে না পারেন, তাঁহার গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮০

৬৯

ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস-লেখক, সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।

বিজ্ঞাপন—রাজসিংহ

৭০

যে সকল অবস্থা-বিশেষে নায়ক-নায়িকাগণকে সংস্থাপিত করিলে, রস-বিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকে সংস্থান বলিতেছি। ইহাতে নৈপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার বা নাটককার কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সংস্থানই রসের আকর।

'চন্দ্রনাথ' গ্রন্থের সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৭১

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্য-পটুতায়, মনুষ্য-চরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপি-চাতুর্য্যে ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপি-কৌশল, যে রচনা-চাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের

হুলালে নাই—সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শন-প্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি, ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্রদৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই।………দীনবন্ধু বাবুর মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত 'বেলেল্লাগিরিতে' প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়। 'কল্পতরু' বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।………যিনি মনুষ্যের শক্তি, মনুষ্যের মহত্ত্ব,—সুখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি এ গ্রন্থে পাইবেন না। যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। যে যাহাতে উপহাসের বিষয়, রহস্য-লেখক তাহার সেই প্রবৃত্তিঘটিত কার্য্যকে আত্যন্তিক বৃদ্ধি দিয়া চিত্রিত করেন। এ আত্যন্তিকতা দোষ নহে—এটি লেখকের কৌশল।

'কল্পতরু'র সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, ১২৮১

৭২

তিনিই (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি—আলালের ঘরের দুলাল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান

৭৩

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই। যে যে গুণ থাকাতে হামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের অসামান্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতেছে, সে গুণ বাঙ্গালা কোন নাটকেই

নাই। একটি গুণের কথা বলি। মানসিক পরিবর্ত্তন। একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু ব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায়, তাহা ভাল নাটকে সুন্দর রূপে চিত্রিত থাকে। ওথেলো—সদাশয় ওথেলো যে অতি অল্পকাল মধ্যে স্ত্রী-ঘাতক হইবেন, অনন্ত চিন্তাশীল হামলেট যে স্বীয় জীবনের জীবন ওফিলিয়াকে বিসর্জ্জন করিবেন, সেই প্রণয়িণীর পিতাকে স্বহস্তে বধ করিবেন, কার্য্যকুশল রাজসম্মানধারী ম্যাকবেথ যে নিদ্রিত, গৃহাগত, অন্নদাতা রাজাকে স্বগৃহে হত্যা করিবেন, তাহা পূর্ব্বে জানা যায় না। কি কৌশলে, কি রূপে মানব-চিত্তের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, নাটকে তাহাই চিত্রিত থাকে। বাঙ্গালা কোন নাটকেই তাহা নাই।

'নয়শো রূপেয়া'র সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮০

৭৪

অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চিত্র করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন দ্বারা সুন্দর

গল্প রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয় ও কিরূপে চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাটককারের প্রধান কার্য্য।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮০

৭৫

যখন হৃদয় কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী।

গীতিকাব্য

৭৬

যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত।

উত্তরচরিত

৭৭

গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

গীতিকাব্য

৭৮

বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, আর এক দল বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য-হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানব-হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক দল আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য-চরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যকতা নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি।

'মানসবিকাশে'র সমালোচনা—

বঙ্গদর্শন, ১২৮০

৭৯

আধুনিক বাঙ্গালী গীতিকাব্য-লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালী কবিগণ সভ্যতা-বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্ব কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক, বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ—জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক-তত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা জন, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্ত-মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধ-গ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতি-গুণ-হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

কবিতার বিষয় বিস্তৃত বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব-শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

৮০

১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরানো দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুস্থদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুস্থদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধুর জীবনী

৮১

কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণমাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে ? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই জীবনী ও সমালোচনা-দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব

৮২

যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদায় অট্টালিকাটি এক কালে দেখিতে হইবে, সাগর-গৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্ত বিস্তার এক কালে

চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য-নাটক-সমালোচনাও সেইরূপ।

উত্তরচরিত

৮৩

গালি এবং ব্যঙ্গ দুইটি পৃথক বস্তু, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গালি ভদ্রের পরিহার্য্য, তদ্দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক এবং সুলেখকের হস্তে তাহা মহাস্ত্র। অনেক লেখক গালিকেই ব্যঙ্গ মনে করেন; পক্ষান্তরে অনেক পাঠক ব্যঙ্গকে গালি মনে করেন। আবার অনেকে নিরর্থক ছেব্লামিকে ব্যঙ্গ মনে করেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮০

৮৪

পুণ্য, পাপ বা ভ্রান্তি কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। পাপ—ভর্ৎসনা, দণ্ড বা শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা ব্যঙ্গের

যোগ্য নহে। তদ্রূপ, ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য। নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থা-বিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে, উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—

বঙ্গদর্শন, ১২৭৯

৮৫

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষ-প্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতা-পরিপূর্ণ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দু'য়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। 'হুতোম পেঁচার নক্‌সা' বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি

দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ ; কেবল ঘোর ইয়ারকি।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব

৮৬

আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা, ডাক্তারের মত সরু লান-সেটখানি বাহির করিয়া, কখন্ কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত-মুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে ; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু

তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর ; শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং।

দীনবন্ধুর কবিত্ব

৮৭

যে যে-গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি এক ছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন ; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দেন ; যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই, তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

বাঙ্গালা ভাষা

ধর্ম্ম ও সমাজ

ধর্ম্ম ও সমাজ

৮৮

ধর্ম্মের মূর্ত্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন—প্রজাপালক। ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে—আপনার উন্নতি-সাধন, আপনার আনন্দ-বর্দ্ধনই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে?

ধর্ম্ম এবং সাহিত্য

৮৯

হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?

ধর্ম্মতত্ত্ব

৯০

কোন পদার্থের অংশ মাত্রকে সেই পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বিঘ্ন হয়। ......যেমন অঙ্গুরীয় মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মো-পাসনাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না।

'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৭৯

৯১

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার ;—বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। সেই অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এ দেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে—সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক।

আনন্দমঠ

৯২

যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কা'র মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না ;—মঙ্গল হইলেই হইল।

দেবী চৌধুরাণী

৯৩

প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারে পালনকর্ত্তা।

আনন্দমঠ

৯৪

দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম্ম ভীতিজাত ; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম।

বঙ্গদেশের কৃষক

৯৫

যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্ট বৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম্ম।

ধর্ম্মতত্ত্ব

৯৬

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য্য বদ্‌মায়েসও চেষ্টা-চরিত্র করিয়া পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাঁহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা।

কৃষ্ণচরিত্র

৯৭

ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।

ধর্ম্মতত্ত্ব

৯৮

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার-উপাসকের

উপাসনা ও নিরাকার-উপাসকের উপাসনা তুল্য ; কেহই তাঁহাকে জানে না। ইহা যদি সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য ; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার-উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে ; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

৯৯

আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীনকালের

জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বর-ভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

কমলাকান্তের দপ্তর

১০০

ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১০১

মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক-আদর্শ-নীত স্বভাব-প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১০২

যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ।

চিত্তশুদ্ধি

১০৩

সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর-বিরোধী নহে; পরস্পর পরস্পরের সহায়।

প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত

১০৪

যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সে-ই ইহলোকেই মুক্ত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১০৫

ইন্দ্রিয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়-সংযম।

চিত্তশুদ্ধি

১০৬

সমুদ্র জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদীসকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়সকল বশ করিয়াছেন, ভোগসকলি আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শান্তিলাভ করেন। যিনি ইন্দ্রিয়-তাড়িত, সুতরাং কামনা-পরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১০৭

ভক্তিই সর্ব্ব সাধনের সার।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১০৮

যে আত্মজয়ী সর্ব্বভূতকে আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, নিষ্কামকর্ম্মী—সেই ভক্ত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১০৯

প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।

কমলাকান্তের দপ্তর

১১০

যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

১১১

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা।

ভালবাসার অত্যাচার

১১২

এ সংসারে প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ।

দুর্গেশনন্দিনী

১১৩

সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।

কপালকুণ্ডলা

১১৪

প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

কপালকুণ্ডলা

১১৫

ভালবাসা বা স্নেহ,—যাহা সংসারে এত আদরের তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে, সম্পদে, সুদিনে, দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ-দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন, আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ, যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয়া হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়।

সীতারাম

১১৬

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কিনা—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়।

বিষবৃক্ষ

১১৭

প্রীতি দ্বিবিধ—সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার বা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই

পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। ……পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্ম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১১৮

ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, প্রীতিতেও তেমনই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তিস্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১১৯

অস্বার্থপর প্রেম এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ।

ভালবাসার অত্যাচার

১২০

স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, তুল্য কথা। উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার উত্তেজনা মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১২১

পরহিতে রতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ।

ভালবাসার অত্যাচার

১২২

পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।

কমলাকান্তের দপ্তর

১২৩

পর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া কে পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করিতে স্বীকার করে? কিন্তু মনুষ্য যদি পরিণামদর্শী হইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত যে, সুখাভিলাষীর এই শেষ আশ্রয়—আত্মসুখের এমন অমোঘ উপায় আর নাই।

চন্দ্রশেখর

১২৪

আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

কপালকুণ্ডলা

১২৫

নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যজাতির গৌরব পৃথিবীর কোন জাতির গৌরবের অপেক্ষা ন্যূন নহে। এমন কোন নৈতিক তত্ত্ব কোন দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বা

নীতিশাস্ত্রে নাই, যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, উক্ত এবং প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় ধর্ম্মনীতির প্রশংসা করিয়া দেশীয় ধর্ম্মনীতিকে অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ এবং অধর্ম্ম-কলুষিত বিবেচনা করেন, তাঁহারা কেবল হিন্দুশাস্ত্রে অজ্ঞতাবশতই এরূপ করেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—
বঙ্গদর্শন, ১২৮০

১২৬

যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ।

কৃষ্ণচরিত্র

১২৭

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল

মনুষ্যের দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য-স্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তারপর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১২৮

ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে। আমরা যাহাকে পীড়ন বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহঃ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে।

রজনী

ধর্ম্ম ও সমাজ

১২৯

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্য-সাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ-জন্য মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

বাহুবল ও বাক্যবল

১৩০

মনুষ্য-জীবন প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র।

জ্ঞান

১৩১

সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য-জীবন বলে।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৩২

যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্য-জীবন-নির্ব্বাহের নিয়ম।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১৩৩

সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য।

মনুষ্যত্ব কি

১৩৪

মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্য-হৃদয়ে একমাত্র তৃষা—অন্য হৃদয় কামনা।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৩৫

মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব।

কৃষ্ণচরিত্র

১৩৬

দমনই প্রকৃত অনুশীলন; কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব মন্মথের অনুচিত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস

করিয়াছিলেন ; কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৩৭

অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৩৮

আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগত্তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিব যে, আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সংবদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৩৯

চিত্ত-সংযম-পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না। অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখ-ভোগই প্রধান শিক্ষা।

বিষবৃক্ষ

১৪০

অবিচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের মূল। পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

বিষবৃক্ষ

১৪১

পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া চির-পরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৪২

সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৪৩

যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৪৪

অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ।

বঙ্গদেশের কৃষক

১৪৫

আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতি-ভাব, তাহাই দয়া।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৪৬

দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ। দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন।

চন্দ্রশেখর

১৪৭

দয়ার অনুশীলন দানে।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৪৮

দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৪৯

বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম্ম জন্মে।

মৃণালিনী

১৫০

মনুষ্য স্ত্রীজাতির প্রেমে অন্ধ হইলে, আর তাহার হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না।

রাজসিংহ

১৫১

যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না। আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল।

বিষবৃক্ষ

১৫২

লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ।

উত্তরচরিত

১৫৩

অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৫৪

ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ-রক্ষার মূল। দণ্ডনীতি —বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৫৫

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ-জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে ; বরং পরম ধর্ম্ম।

কৃষ্ণচরিত্র

১৫৬

আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙ্গালী জাতি, আজি শত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি।

কৃষ্ণচরিত্র

১৫৭

স্নমতি নামে দেবকন্যা এবং কুমতি নামে রাক্ষসী এই দুই জন সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে।

কৃষ্ণকান্তের উইল

১৫৮

সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৫৯

পৃথিবীতে পর-নিন্দা প্রধান সুখ—বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান হয়, তবে আরও সুখ।

বাঙ্গালা শাসনের কল

১৬০

কাপুরুষের স্বভাব এই যে আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে।

কৃষ্ণচরিত্র

১৬১

যাহার শক্তি আছে, সেই স্বেচ্ছাচারী। যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল।

সাম্য

১৬২

দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করা, বলবানের স্বভাব। সেই পীড়ন-নিবারণ-জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজ্য-শাসন-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা। যদি কোন রাজ্যে দুর্ব্বলকে বলবানে পীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ।

বঙ্গদেশের কৃষক

১৬৩

যে রাজ্য পরজাতি-পীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা

১৬৪

এই ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল—
বঙ্গদর্শন, ১২৮১

১৬৫

রাজার রাজ্য আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান। যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।

সীতারাম

১৬৬

সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী। মনুষ্য অকরুণ।

কৃষ্ণকান্তের উইল

১৬৭

মূর্খ তিনজন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্য ব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ।

মৃণালিনী

১৬৮

যিনি কোন প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি মনুষ্যজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য।

বাঙ্গলা শাসনের কল

১৬৯

উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক। উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়।

জাতিবৈর—সাধারণী, ১২৮০

১৭০

যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতিপদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়।

কৃষ্ণকান্তের উইল

১৭১

কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপু কর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছ্বলিত

মনোবৃত্তিসকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন—সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না—তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্ত-সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহা তেজস্বী। একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়ন-প্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধ বর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে। ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্র বিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগ-শোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্ত-সংযম-পক্ষে প্রথমতঃ চিত্ত-সংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্ত-সংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্ত-সংযম-পক্ষে শিক্ষাই মূল।

বিষবৃক্ষ

১৭২

পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না।

আনন্দমঠ

১৭৩

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্ত-সংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না।

বিষবৃক্ষ

১৭৪

যিনি এই পাপপূর্ণ মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

বহুবিবাহ

১৭৫

যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া কাজ করে, বুঝিতে পারে না যে পবিত্র মানুষ আছে; সুতরাং তাহার কার্য্য ধ্বংস হয়।

সীতারাম

১৭৬

সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভাণের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া-বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভাণ বলিতেছি। এ জিনিষ এদেশে বড় ছিল না— এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। মৌখিক 'Lie direct' সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি—কার্য্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সেকালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, 'Lie direct' সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না। দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজি শিক্ষার গুণে হিন্দু-পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে।

আদি ব্রাহ্ম সমাজ—প্রচার,

১২৯১-৯২

১৭৭

এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্য প্রাপ্তি।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৭৮

পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা, মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা-মাতার পিতা-মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়।

সীতারাম

১৭৯

যদি বাপকে ঠকাইলাম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জুয়াচুরী করিতে আমার আট্‌কাইবে?

দেবী চৌধুরাণী

১৮০

ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি বা পুত্র-মুখ-নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহ-বন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি-শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

কমলাকান্তের দপ্তর

১৮১

বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।

কপালকুণ্ডলা

১৮২

স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন।

চন্দ্রশেখর

১৮৩

আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি ; এবং অনেকস্থলেই আমাদিগের প্রবৃত্তি-সকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল।

প্রাচীনা এবং নবীনা

১৮৪

স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য-সুখ নহে ; একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা, ইহাই দাম্পত্য-সুখ।

সীতারাম

১৮৫

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য।

প্রাচীনা এবং নবীনা

১৮৬

হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ হিন্দু সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

দেবী চৌধুরাণী

১৮৭

গৃহিণী ব্যজন-হস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারী-ধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর পাঁচ জন দাসী আছে, কিন্তু স্বামী-সেবা আর কাহার সাধ্য করিতে আসে? যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্ম লোপ করিতেছে, হে আকাশ, তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?

দেবী চৌধুরাণী

১৮৮

যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি?

দেবী চৌধুরাণী

১৮৯

সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে।

সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ড প্রণেতা, ভরণ-পোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৯০

সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।

আনন্দমঠ

১৯১

মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত প্রয়োগে সামাজিক দুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ—সামাজিক অত্যাচার।

বাহুবল ও বাক্যবল

১৯২

যাহা অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দুঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা আছে, যন্ত্রণা

কমান যাইতে পারে। সুতরাং যাহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ-নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না।

বাহুবল ও বাক্যবল

১৯৩

গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মরোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও দৈহিক পরমাণু-মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানেই চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তা-শালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল।

চঞ্চল জগৎ

১৯৪

যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না ; কেন না, হিন্দুসমাজের পূর্ব্বকালীন গতি অনেক দূর সাংখ্য-প্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন।

সাংখ্যদর্শন

১৯৫

গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা তাহা জানি না—আমরা তাই সমাজ-সংস্করণকে একটা পৃথক জিনিস বলিয়া খাড়া করিয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতি-প্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজ-সংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতি লাভ করা যায়—বিশেষ, সংস্করণ-পদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুগ তার বড় ভাল লাগে। সমাজ-সংস্করণ

আর কিছুই হউক না হউক, একটা হুজুগ বটে। হুজুগ বড় আমোদের জিনিস। এই সম্প্রদায়ের লোক-দিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজ-সংস্কার কিসের জোরে হইবে? রাজনৈতিক উন্নতির মূল ধর্ম্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্ম্মের উন্নতিতে মন দাও।

কৃষ্ণচরিত্র

১৯৬

জাগতিক প্রীতি এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না, কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্ট সাধন করিব ;—সাধ্যানুসারে পর সমাজেরও তেমনি ইষ্ট সাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না, কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্ট

সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহারেও আপন সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

১৯৭

ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্ব-লৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতি-বৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

১৯৮

ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধৰ্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব।

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism-প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশ-বাৎসল্য-ধর্ম্ম না লিখেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৯৯

ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রা-পূজাই ইহার কারণ।

লোকরহস্য

২০০

আকাশ যেমন বস্তুতঃ নীল নয়, আমরা নীল দেখি মাত্র; ধন তেমনই। ধন সুখের নয়, আমরা সুখের বলিয়া মনে করি।

ইন্দিরা

২০১

তোমার বাহ্য সম্পদে কয়জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয়জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয়জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? একজনও না। যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এ ছাই আমরা চাহি না।

কমলাকান্তের দপ্তর

২০২

উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল।

বাঙ্গালীর বাহুবল

২০৩

যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না; এমত প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে। ইহার উপর আপীল নাই।

বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

বাহুবল ও বাক্যবল

২০৪

গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না। যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে। বে-পরদা বা কড়ি-মধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেমস্ মাকিণ্টশ্ তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির কড়ি-মধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকের পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শুনে?

কমলকান্তের দপ্তর

২০৫

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট—ইহাই সাম্য-নীতি।

সাম্য

২০৬

হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্য-রূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান রাজাসকল হিন্দু রাজাসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দুরাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট।

রাজসিংহ

নানা কথা

নানা কথা

২০৭

শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে।

সীতারাম

২০৮

রূপ রূপবানে নাই, দর্শকের মনে; নহিলে এক-জনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন?

রজনী

২০৯

সৌন্দর্য্য-তৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প

২১০

ইহসংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ

কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত। পরিতৃপ্তি রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

কমলাকান্তের দপ্তর

২১১

যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহ-জীবনে সেই প্রিয়।

সীতারাম

২১২

সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

কৃষ্ণকান্তের উইল

২১৩

মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখ-স্রোত শমিত কি বৰ্দ্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে ? সংসার-রচনা অপূৰ্ব্ব কৌশলময়।

কপালকুণ্ডলা

২১৪

স্বরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত।

সঙ্গীত

২১৫

কণ্ঠ-ভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন।

সঙ্গীত

২১৬

বৎসরে কি কালের মাপ ? ভাবে ও অভাবে কালের মাপ।

চন্দ্রশেখর

২১৭

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর ? না সেই পুরাতনই সুন্দর ? তবে তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ।

অনন্তের একটুখানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটু-খানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ; তাই তুমি এত উন্মাদকর।

সীতারাম

২১৮

বেগবান হৃদয়কে বিশ্বাস নাই।

মৃণালিনী

২১৯

শ্মশানে লজ্জা থাকে না।

সীতারাম

২২০

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিত কালে আপন আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ-কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোক-

রঞ্জন অপেক্ষা লোক-হিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখনও ভস্মাচ্ছন্ন, কখন প্রদীপ্ত; তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না ; কেন না, অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

সঞ্জীবনী সুধা

২২১

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্ব প্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম, অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম—

"যশের পণ্যশালা।
বিক্রেয়—অনন্ত যশ।
বিক্রেতা—কাল।
মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।"

কমলাকান্তের দপ্তর

২২২

মানুষ যে কতবার মরে, তাহা আমরা বুঝি না। এক দেহেই কতবার যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মনেও করি না।

সীতারাম

২২৩

সকল লোকেরই প্রায় এমন না এমন একদিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, "হয় সাবেক চাল ছাড়—নয় আমায় ছাড়।" অনেকেই উত্তর দেন, "মা, তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।"

দেবী চৌধুরাণী

২২৪

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে, অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমান-শক্তি না থাকিলে আমরা প্রায়ই কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান-দর্শনাদি অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

জ্ঞান

২২৫

তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর!

কমলাকান্তের দপ্তর

২২৬

মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ।...... দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্য-সমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই, তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্য-সমাজে মুদ্রা-মহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধাম্মিক বলে—মুদ্রা-

হীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্য-শাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়!

লোকরহস্য

২২৭

বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগের (বাবুদিগের) দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারা সকল অবতারেই অমিতবল-পরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র; ষ্টেসন-মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চাল-কলা-প্রত্যাশী পুরোহিত; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকীল অবতারে বধ্য মোয়াক্কেল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমিদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

বাবু

২২৮

হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ, হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু-পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে।......ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনালকোড ছিলে—তুমি পীনালকোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনালকোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনালকোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনালকোডের উপর তোমার এই সর্‌দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে। পীনালকোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ

করিয়াছে—সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র! ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই।

দেবী চৌধুরাণী

২২৯

আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া চাঁদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতী, হাকিমী, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিতে করিতে অধীর হইতেছেন। গলাবাজির জোরে, আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা বড়লোক হইতেছেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর

সীমা নাই, সর্ব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে, আর কেহ বে-আইনি করিয়া সুবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন-দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায়।

বঙ্গদেশের কৃষক

২৩০

লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই। একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বেদী-পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস-নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেম-প্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ-সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—

শিখিত যে, ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ-পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য— সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে।

লোকশিক্ষা

২৩১

আমার মর্ম্মের দুঃখ আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না— দুঃখ-প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না; সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না।......পরের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয়জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে?

রজনী

২৩২

কত লোকে মনে মনে মৃত্যু-কামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যু-কামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখীজনে মৃত্যু-কামনা করে। আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

কৃষ্ণকান্তের উইল

২৩৩

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ-বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক, চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা

মাজা কালো কালো তুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

কমলাকান্তের দপ্তর

২৩৪

মনে মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই একগাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চির-প্রাচীন ভুবন-মণ্ডল ত আজিও নবীন! আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্য-মাখা, হীরা-বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল-কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা এবং নক্ষত্রের উজ্জলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল

আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন কোম্পানীর দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চসমা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়াবয়স স্বীকার করিব না।

কমলাকান্তের দপ্তর

২৩৫

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচিবিক্ষেপ-শালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না; ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস-ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া

রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গা-বক্ষ হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

"সাধো আছে মা মনে—
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে!"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের স্থর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্য-ময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী

২৩৬

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে—নবদ্বীপ।......বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর্ তর্ রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে

রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য, কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ?

কমলাকান্তের দপ্তর

২৩৭

আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটী নাই। কেবল আলো—অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোকময় মূর্ত্তি। সেখানে শব্দ নাই,

কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্ব্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে, এমনি লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি, আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রী-মূর্ত্তি; কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে, আমি সে দিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে, কে? যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রী-মূর্ত্তি। সে-ও জ্যোতির্ম্ময়ী; কিন্তু চারিদিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা; কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রী-মূর্ত্তি কাঁদিতেছে, আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া ঢেউ দিতে দিতে সেই চতুর্ভুজের সিংহাসন-তলে আনিয়া ফেলিল।

আনন্দমঠ

২৩৮

আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জল-রাশির উপরে দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসি-তেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি এই—মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্ত রত্নভূষিতা এক্ষণে কাল-গর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তিশোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কাল-স্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণপ্রহারিণী শত্রু-মর্দ্দিনী,

বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল-স্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

কমলাকান্তের দপ্তর

—— ——

বর্ণনা

বর্ণনা

২৩৯

তুমি জড় প্রকৃতি, তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিণি! কালি! তুমি ললাটে চাঁদের টিপ্ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকতবালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে কত সুখে যুবক-যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজ এ কি? তুমি

অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্ব-নাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী! তুমি ঐশী-মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

চন্দ্রশেখর

২৪০

তুমি গ্রাহ্য কর, না কর, তাই বলিয়া ত জড়-প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচি-মালা ছিঁড়ে না, —তারা তেমনি জলে—তীরে বৃক্ষ তেমনই দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনই খেলে। জড়-প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

চন্দ্রশেখর

২৪১

যখন নৈশ-নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে-মধুরে মিশে ; যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবরলোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে-মধুরে মিশে ; যখন স্বচ্ছ নীলসরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীলজলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মি-মালার উপরে দীর্ঘরশ্মিসকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে চায়, তখন উজ্জ্বলে-মধুরে মিশে ;······যখন সন্ধ্যাকালে গগনমণ্ডলে সূর্য্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া, নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে-মধুরে মিশে ;······যখন চন্দ্রকিরণ-প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু-প্রপীড়নে সফেন তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোতে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে-মধুরে মিশে।

চন্দ্রশেখর

২৪২

প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল —মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকা-তলে প্রহত হইতে লাগিল। তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও, কিন্তু প্রভাত-বায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাত-বায়ু বড় মধুর—চোরের মত পা টিপি-টিপি আসিয়া এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকাদাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে, কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গ-গ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ, এই ক্রীড়াশীল মধুরপ্রকৃতি প্রভাত-বায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে; আকাশস্থ দুই-একখানা কাল মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে; তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে; স্নানাবগাহন-নিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে; নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার

কাণের কাছে মধুর সঙ্গীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে, বায়ু বড় ধীর প্রকৃতি—বড় গম্ভীর-স্বভাব, বড় আড়ম্বরশূন্য—আবার সদানন্দ। সংসারে যদি সকলেই এমন হয় ত কি না হয়! দে নৌকা খুলিয়া দে! রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে যে, বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে ;······ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কাণে মিশাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কাণের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জ্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা ; তরঙ্গসকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবনদেবকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

চন্দ্রশেখর

২৪৩

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূর-বিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে সিকতাশ্রেণী অধিকতর ধবল শ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতিজ্ঞানে কখনও কখনও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত, যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট-দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে তারকামালা অনন্ত সংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীশ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকা-কণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

চন্দ্রশেখর

২৪৪

ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ নীলজল-মণ্ডল-মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গ-ক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি-হৃদয়ে উড়িতেছিল।

কপালকুণ্ডলা

২৪৫

যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধ রশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ডসকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে, বন্য বৃক্ষ-লতাসকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্রসকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে, নীরবে লতাগুল্ম-মধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। পশু-পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎমাত্র ভগ্ন-বিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষ-স্পন্দন-শব্দ; কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাত-শব্দ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্র-মধ্যে উরগজাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিত শব্দ; ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুর-রব। এমত নহে যে, একেবারে বায়ু বহিতেছিল না; মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ; একান্ত নিঃশব্দ বায়ুমাত্র; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল; কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামলতা দুলিতেছিল; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদ-খণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল।

কপালকুণ্ডলা

২৪৬

চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকারসকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল।

আনন্দমঠ

২৪৭

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে, ঠিকানা নাই। আজ হাট-বার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায়

তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা- তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্য-মধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্য-সমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ু-প্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

আনন্দমঠ

২৪৮

পূর্ণিমার রাত্রি—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্

গুম্—সর্ব্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই। কেহ হুর্‌রে করিতেছে না, কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ডাকিতেছে মা! কেহ ডাকিতেছে বাপ! কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান একত্রে জড়াজড়ি; জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘমাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সেই রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।

আনন্দমঠ

২৪৯

কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুক্কুরের রব।······ (কল্যাণী) মনে করিলেন, চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই।

এইরূপ চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি-দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আর একটা আসিল, তারপর আরও একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

আনন্দমঠ

২৫০

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর-কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনার কম মনুষ্যকে—কত কোটি তা কে জানে—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কাল-গ্রাসে

পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেত-ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্তাঙ্কিত চরণে চরণ-ভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে,

বয়স্তার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকেরা বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদির লালন পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়-তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্যহস্তীসকল মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই; চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমিদারের খাজনা দিতে পারে না; জমিদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমিদার-সম্প্রদায় সর্ব্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহু-প্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না, কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহা পায়, কাড়িয়া খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলিল। সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

আনন্দমঠ

২৫১

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার-মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার;—অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া, তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর্-তর্ কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন,

প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন ; সর্ব্বশুদ্ধ, একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

দেবী চৌধুরাণী

২৫২

কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল বিচিত্র চারু চিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্তজনে দশভুজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, মহিষাসুরের যুদ্ধ, দশ অবতার, অষ্ট নায়িকা, সপ্ত মাতৃকা, দশ মহাবিদ্যা, কৈলাস, বৃন্দাবন, লঙ্কা, ইন্দ্রালয়, নবনারী-কুঞ্জর, বস্ত্র-হরণ, সকলই চিত্রিত। সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ—মখমলের কামদার বিছানা, তিন দিকে সেইরূপ বালিস। সোণার আতরদান, তারই গোলাব-পাশ, সোণার বাটা, সোণার পুষ্পপাত্র, তাহাতে রাশিকৃত সুগন্ধি ফুল, সোণার আলবোলা, পোরজরের সট্‌কা—সোণার মুখনলে মতির থোপ দুলিতেছে—তাহাতে মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দু-

পাশেই দুই রূপার ঝাড়, তাহাতে বহুসংখ্যক সুগন্ধি দীপ রূপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে ; উপরের ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ সোণার শিকলে লট্‌কান আছে। চারি কোণে চারিটি রূপার পুতুল চারিটি বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে।

দেবী চৌধুরাণী

২৫৩

ছেলে, বুড়ো, কাণা, খোঁড়া, যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল। যে রাঁধিতেছিল, সে হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিল ; যে মাছ কুটিতেছিল, সে মাছে চুপড়ি চাপা দিয়া ছুটিল ; যে স্নান করিতেছিল, সে ভিজে কাপড়ে ছুটিল। যে খাইতে বসিয়াছিল, তার আধপেটা বই খাওয়া হইল না। যে কোন্দল করিতেছিল, শত্রু-পক্ষের সঙ্গে হঠাৎ তার মিল হইয়া গেল। যে······ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, মার কোলে উঠিয়া······বৌ দেখিতে চলিল। কাহারও স্বামী আহারে বসিয়াছেন, পাতে ডাল-তরকারী পড়িয়াছে, মাছের ঝোল পড়ে নাই, এমন সময়ে বৌয়ের খবর

আসিল, আর তাঁর কপালে সেদিন মাছের ঝোল হইল না। এইমাত্র বুড়ী নাতিনীর সঙ্গে কাজিয়া করিতেছিল যে "আমার হাত ধরিয়া না নিয়ে গেলে, আমি কেমন করে পুকুরঘাটে যাই?" এমন সময়ে গোল হইল, বৌ এসেছে, অমনি নাতিনী আয়ি ফেলিয়া বৌ দেখিতে গেল, আয়িও কোন রকমে সেইখানে উপস্থিত। এক যুবতী মার কাছে তিরস্কার খাইয়া শপথ করিতেছিলেন যে, তিনি কখনও বাড়ীর বাহির হন না, এমন সময়ে বৌ আসার সংবাদ পৌছিল, শপথটা সম্পূর্ণ হইল না; যুবতী বৌয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। মা শিশু ফেলিয়া ছুটিল, শিশু মার পিছু পিছু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। ভাশুর স্বামী বসিয়া আছে, ভ্রাতৃবধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

দেবী চৌধুরাণী

২৫৪

অতি প্রত্যূষে—তখনও গাছের আশ্রয় হইতে অন্ধকার সরিয়া যায় নাই—অন্ধকারের আশ্রয় হইতে নক্ষত্রসব সরিয়া যায় নাই, এমন সময়ে দলে দলে পালে

পালে জীয়ন্ত মানুষের কবর দেখিতে লোক আসিতে লাগিল। একটা মানুষ মরা, জীবিতের পক্ষে একটা পর্ব্বের সমান। যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাঠ প্রায় পূরিয়া গিয়াছে, অথচ নগরের সকল গলি, পথ, রাস্তা হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর মত মনুষ্য বাহির হইতেছে। শেষে সে বিস্তৃত স্থানেও স্থানাভাব হইয়া উঠিল। দর্শকেরা গাছে উঠিয়া কোথাও হনুমানের মত আসীন—যেন লাঙ্গুলাভাবে কিঞ্চিৎ বিরস;—কোথাও বাদুড়ের মত দোদুল্যমান, দিনোদয়ে যেন কিঞ্চিৎ সরস। পশ্চাতে নগরের যে কয়টা কোটাবাড়ী দেখা যাইতেছিল, তাহার ছাদ মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, আর স্থান নাই। কাঁচা ঘরই বেশী, তাহাতেও মই লাগাইয়া, মইয়ে পা রাখিয়া, অনেকে চালে বসিয়া দেখিতেছে। মাঠের ভিতর কেবল কালো মাথার সমুদ্র—ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। কেবল মানুষ আসিতেছে, জমাট বাঁধিতেছে, সরিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে,আবার মিশিতেছে। কোলাহল অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল। চীৎকার, গণ্ডগোল, বকাবকি, মারামারি আরম্ভ করিল।·····

কেহ বলে, 'আল্লা'! কেহ বলে, 'হরিবোল'! কেহ বলে, 'আজ হবে না, ফিরে যাই।' কেহ বলে, 'ঐ এয়েছে, চেয়ে দেখ্!' যাহারা বৃক্ষারূঢ়, তাহারা কার্য্যাভাবে গাছের পাতা, ফুল এবং ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া নিম্নচারীদিগের মাথার উপর ফেলিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে, যেখানে যেখানে বৃক্ষ, সেইখানে সেইখানে তলচারী এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে বড় লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্র-মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত তাহা প্রায় জনশূন্য। দুই চারিজন লোক সেখানে আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন গোলযোগ করিতেছে না; নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে, তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় জোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে।

সীতারাম

২৫৫

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ-শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত, পৃথিবী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়,—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্‌তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ-মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ; আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্ন-গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তর-গঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি,

গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—যোজনের উপর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ ; সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র-মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে! তা যাক—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর-মূর্ত্তিসকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিকম্পিত-চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষ-

মূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? ....
তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক ;—এ সকল হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সীতারাম

২৫৬

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেত সৈকত-পুলিন-মধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরীগণ-প্রধানা মহানগরী দিল্লী প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে—সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদি-প্রস্তর-নির্ম্মিত মিনার, গুম্বজ, বুরুজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতি দূরে কুতবমিনারের বৃহচ্চূড়া ধূমময় উচ্চ স্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল। নিকটে জুম্মা মস্‌জীদের চারি মিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উঠিয়াছে। রাজপথে রাজপথে পণ্যবীথিকা; বিপণিতে শত শত দীপমালা,

পুষ্প-বিক্রেতার পুষ্পরাশির গন্ধ, নাগরিকজন-পরিহিত পুষ্পরাজির গন্ধ, আতর-গোলাপের সুগন্ধ, গৃহে গৃহে সঙ্গীত-ধ্বনি, বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ, নাগরীগণের কখন উচ্চ কখন মধুর হাসি, অলঙ্কার-শিঞ্জিত,—এই সমস্ত একত্র হইয়া নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে। ফুলের ছড়াছড়ি, আতর-গোলাপের ছড়াছড়ি, নর্ত্তকীর নূপুর-নিক্কণ, গায়িকার কণ্ঠে সপ্তসুরের আরোহণ অবরোহণ, বাদ্যের ঘটা,……বিকট, কপট, মধুর, চতুর, চতুর্ব্বিধ হাসি; পথে পথে অশ্বের পদ-ধ্বনি, দোলায় বাহকের বীভৎস-ধ্বনি, হস্তীর গল-ঘণ্টার ধ্বনি, এক্কার ঝন্‌ঝনি—শকটের ঘ্যান্‌-ঘ্যানানি।

রাজসিংহ

২৫৭

প্রভাতে বাদশাহী-সেনা কুচ করিতে আরম্ভ করিল; সর্ব্বাগ্রে পথ-পরিষ্কারক সৈন্য পথ-পরিষ্কারের জন্য সশস্ত্রে ধাবিত। তাহাদের অস্ত্র কোদালি, কুড়ালি,

দা ও কাটারি। তাহারা সম্মুখের গাছসকল কাটিয়া, সরাইয়া, খানা-পয়গার বুজাইয়া, মাটি চাঁচিয়া, বাদশাহী-সেনার জন্য প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। সেই প্রশস্ত পথে কামানের শ্রেণী শকটের উপর আরূঢ় হইয়া ঘড়্ ঘড়্ হড়্ হড়্ করিয়া চলিল – সঙ্গে গোলন্দাজ সেনা। অসংখ্য গোলন্দাজি গাড়ির ঘড়্ ঘড়্ শব্দে কর্ণ বধির—তাহার চক্র-সহস্র হইতে বিঘূর্ণিত ও উর্দ্ধোত্থিত ধূলিজালে নয়ন অন্ধ ; কালান্তক যমের ন্যায় ব্যাদিতাস্য কামানসকলের আকার দেখিয়া হৃদয় কম্পিত। এই গোলন্দাজ সেনার পশ্চাৎ রাজ-কোষাগার। ······অনন্তর ধনরত্নরাজি-পরিপূর্ণ গজাদিবাহিত রাজ-কোষের পর বাদশাহী দফ্তরখানা চলিল। থাকে,থাকে, থাকে—গাড়ী, হাতী, উটের উপর সাজান খাতা-পত্র বহিজাত ; সারির পর সারি, শ্রেণীর পর শ্রেণী ; অসংখ্য, অনন্ত চলিতে লাগিল। তারপর গঙ্গাজলবাহী উটের শ্রেণী। গঙ্গাজলের মত সুপেয় কোন নদীর জল নহে, তাই বাদশাহদিগের সঙ্গে অর্দ্ধেক গঙ্গার জল চলিত। জলের পর আহার্য্য—আটা, ঘৃত, চাউল, মশলা, শর্করা, নানাবিধ পক্ষী, চতুষ্পদ—প্রস্তুত, অপ্রস্তুত, পক্ব,অপক্ব ভক্ষ্য

চলিত। তার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বাবুর্চি। তৎপশ্চাৎ তোষাখানা—এল্‌বাস-পোষাকের, জেওরাতের হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি ; তারপর অগণনীয় অশ্বারোহী মোগল-সেনা। এই গেল সৈন্যের প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাদশাহ খোদ। আগে আগে অসংখ্য উষ্ট্রশ্রেণীর উপর জ্বলন্ত-বহ্নিবাহী, বৃহৎ কটাহসকলে ধূনা, গুগ্‌গুল, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য। সুগন্ধে ক্রোশ ব্যাপিয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমোদিত। তৎপশ্চাৎ বাদশাহী খাস্‌ আহদী সেনা, দোষশূন্য রমণীয় অশ্বরাজির উপর আরূঢ়, দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মধ্যে বাদশাহ নিজে মণিরত্নকিঙ্কিণীজালাদি-শোভায় উজ্জ্বল উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্বের উপর আরূঢ়—শিরোপরি বিখ্যাত শ্বেতচ্ছত্র। ......তৃতীয়ভাগে পদাতি-সৈন্য। তৎপশ্চাৎ দাস-দাসী, মুটে-মজুর, নর্ত্তকী প্রভৃতি বাজে লোক, খালি ঘোড়া, তাম্বু রাশি রাশি, এবং মোট-ঘাট। যেমন ঘোরনাদে গ্রাম প্রদেশ ভাসাইয়া—তিমি-মকর-আবর্ত্তাদিতে ভয়ঙ্করী বর্ষাবিপ্লাবিতা স্রোতস্বতী ক্ষুদ্র সৈকত ডুবাইতে যায়, তেমনই মহা কোলাহলে, মহা বেগে, এই পরিমাণরহিতা, অসংখ্যেয়া

বর্ণনা

বিস্ময়করী মোগলবাহিনী রাজসিংহের রাজ্য ডুবাইতে চলিল।

রাজসিংহ

২৫৮

রাত্রিটা ভাল নহে ; মধ্যে মধ্যে গভীর হুঙ্কারের সহিত প্রবল বায়ু বহিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতায়ন-পথ-লক্ষ্য গিরিশিখরমালায় প্রগাঢ় অন্ধকার—কেবল যথায় রাজপুতের শিবির, তথায় বসন্ত-কাননে কুসুমরাজি তুল্য, সমুদ্রে ফেননিচয় তুল্য এবং কামিনী-কমনীয় দেহে রত্নরাশির তুল্য, একস্থানে বহুসংখ্যক দীপ জলিতেছে—আর সর্ব্বত্র নিঃশব্দ, প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কদাচিৎ সিপাহীর হস্তমুক্ত বন্দুকের প্রতিধ্বনিতে ভীষণ। কখনও বা মেঘের "অদ্রিগ্রহণ-গুরুগর্জ্জিত,"—কখনও বা একমাত্র কামানের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত তুমুল কোলাহল। রাজপুরীর অশ্বশালায় ভীত অশ্বের হ্রেষা, রাজপুরীর উদ্যানে ভীত হরিণীর কাতরোক্তি।

রাজসিংহ

২৫৯

সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনী-দত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভা-মণ্ডলে পরিচারক-হস্ত-জ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যান-কুসুমসমূহের ন্যায় আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদী হৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতর বেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণী-হৃদয়ে নায়ক-সংস্পর্শ-জনিত প্রকম্পের ন্যায় নদী-ফেনপুঞ্জে শ্বেত পুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহুলোকের কোলাহলের ন্যায় বীচি-রব উত্থিত হইল। নাবিকেরা নৌকাসকল তীর-লগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

মৃণালিনী

২৬০

নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্ম্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্র-খচিত, ক্বচিৎ স্তর-পরম্পরা-বিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালায় বিভূষিত। বাতায়ন-পথে অদূরবর্ত্তিনী

ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল ; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বল তরঙ্গিনী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী।··· বাতায়ন-পথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গা-তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশা-সমাগমে প্রফুল্ল বন্যকুসুম-সংস্পর্শে সুগন্ধি। চন্দ্রকর-প্রতিঘাতী শ্যামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধূত করিয়া, নদীতীর-বিরাজিত কাশ-কুসুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিতেছিল।

মৃণালিনী

২৬১

অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জ্বলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ শ্বেত-প্রস্তরের বেদীর উপরে রত্নপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে, রত্নপ্রবালমণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীয়ান্ রাজা বসিয়া আছেন। শিরোপরি কনক-কিঙ্কিণী-সংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। এক দিকে পৃথগাসনে হোমাবশেষ-বিভূষিত অনিন্দ্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ-

মণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিল। অন্য দিকে মহামাত্য ধর্ম্মাধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, গৌল্মিকগণ, ক্ষত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ডরিক্য, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্রে সভার অসাবধানতা রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজন হইতে পৃথগাসনে, কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।

মৃণালিনী

২৬২

শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাম্বু অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া প্রভাসিত

হইতেছিল। তদুপরি স্পন্দন-রহিত কুসুমশ্রেণী অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হইয়া নীলজলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; চারিদিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরস্পরাশ্লিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল; ক্বচিৎ দুই একটি দীর্ঘ শাখা ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছিল! তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জ-মধ্য হইতে নবস্ফুট কুসুম-সৌরভ আসিতেছিল।

মৃণালিনী

২৬৩

গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়, তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি—যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কত রকমের কত নৌকা; জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, দাঁড়ি-মাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল; তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল; কত রকমের কত লোক, কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথায় সাদা মেঘের মত

অসীম সৈকতভূমি—তাতে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী।

ইন্দিরা

২৬৪

নৌকাপথে কলিকাতা আসিতে দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ে বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, তার পিঠে বাড়ী, অট্টালিকার সমুদ্র—তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া জ্ঞান-বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নৌকার অসংখ্য, অনন্ত শ্রেণী দেখিয়া মনে হইল, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে? নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তীরবর্ত্তী রাজপথে গাড়ী পাল্কী পিপ্‌ড়ের সারির মত চলিয়াছে—যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যার ত কথাই নাই।

ইন্দিরা

২৬৫

নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে। কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাক্‌ছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষকেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন,

কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্র-গ্রামের ঘাটে কুল-কামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্করা শিব-পূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিত-নয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গা-স্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন।······আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোটলোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্র-

গমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

বিষবৃক্ষ

২৬৬

পরে একদিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। ... ... ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেককাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি,ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোওয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোফে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে।

বিষবৃক্ষ

২৬৭

আকাশে মেঘাড়ম্বর-কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধ তমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ,

নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বন-বিটপীসকল সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা-পরিমণ্ডিত হইয়া হীরক-খচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জন-বিরত শ্বেত-কৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নববারি-সমাগম-প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লী-রব মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষ-পত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতন-শব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্র-চ্যুত-জলবিন্দু-পতন-শব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত-জলে শৃগালের পদ-সঞ্চারণ-শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জলমোচনার্থ পক্ষ-বিধূনন-শব্দ, মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষ-পত্র-চ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতন-শব্দ।

বিষবৃক্ষ

২৬৮

কুন্দ নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক্ হইল। এত বড় বাড়ী সে কখনও দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎ পুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে গো-গণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণ-বিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত, সকুসুম পুষ্পবৃক্ষসকল বিচিত্র পুষ্প-পল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড় তলা বৈঠক-খানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেণ্ডায় বড় বড় মোটা ফ্লুটেড্ থাম ; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মর-প্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃন্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া, লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি একতলা কোঠা ; এক

সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারী, আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারী-বাড়ী।" ইহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী।" পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতলা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধূমধাম হয়, কিন্তু এই উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দরদালান, পায়রায় পূরিয়া উঠিয়াছে, কুঠারিসকল আসবাবে ভরা, চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট "নাটমন্দির"। তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারীদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা, চন্দন-তিলক-বিশিষ্ট পূজারীর দল, পাচকের দল; কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাস-দাসীরা

কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী-ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া দত্ত-বাড়ীর দাসী-মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রু-বিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে-ছেন। কোথাও কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি-ময়দার পরিমাণ লইয়া গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ককণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগী-রঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে "মধো কানের" কি "গোবিন্দ অধিকারী"র গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া

বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাটমন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতাপিতার উদ্দেশে নানা প্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে। এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারী-বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দরমহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য ; তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত এবং তাঁহাদের নিজ-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামাগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন,······এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটী। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত ; ঘরসকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়-কুটুম্ব-কন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি-দিবা কলকল করিত ; এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্য-পরিহাস, কলহ,

কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন্", "কাপড় দে", "ভাত রাঁধলে না", "ছেলে খায় নাই", "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুর-বাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরও জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া পা গোট করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া, চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গী করিয়া আছেন; কেন না, তপ্ত তৈল ছিট্‌কাইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে; কেহ বা স্নানকালে বহু তৈলাক্ত অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্ত-দেশে বাঁধিয়া ডালে কাঠি দিতেছেন—যেন রাখাল পাঁচনী-হস্তে গরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ,

কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটোল, শাক কুটিতেছে। তাতে ঘস্ ঘস্, কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে ; মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে, এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদীর স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামায়ের বড় চাকরী হইয়াছে—সে দারোগার মুহুরী, গোপাল উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে বিশ্ব-বাঙ্গালায় নাই, ইংরেজেরা নাকি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, ······এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচনা হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্য প্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীর-গৌরব এবং হস্ত-লাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না ; কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না। কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডার-মধ্যে দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন

যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে, যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোনরূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে, কাঙ্গালী, কুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহারা অবকাশমতে "দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ" করত বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকার-প্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাত অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে। এই তিন মহল অন্দরমহলের পর পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান-পরে নীল মেঘখণ্ডতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীর-বেষ্টিত। ভিতর-বাটীর তিন মহল ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই দুই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়। বাটীর বাহিরে আস্তাবল, হাতীশালা, কুক্কুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল।

বিষবৃক্ষ

২৬৯

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারে স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষ-শিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

বিষবৃক্ষ

২৭০

ভুবনসুন্দরী বারাণসি! কোন্ সুখীজন এমন শারদরাত্রে তৃপ্তলোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গা-হৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে চাও, সেই দিকে আকাশে নক্ষত্র—অনন্ত তেজে অনন্ত কাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—

নীলাম্বরবৎ স্থির নীল তরঙ্গিণী-হৃদয় ; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এইরূপ আলোকরাজি-শোভিত অনন্ত প্রাসাদশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদী-নীরে প্রতিবিম্বিত—আকাশ, নগর, নদী—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময়।

বিষবৃক্ষ

২৭১

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়না মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান—উদ্যান-বৃক্ষের এবং উদ্যান-প্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানা বর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড়

হীরার মত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে জলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান-ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

কৃষ্ণকান্তের উইল

২৭২

হিরণ্ময়ী……অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্ত্তী সাগর-তরঙ্গে সূর্য্য-কিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদু পবন বহিতেছে—মৃদু পবনোত্থিত অতুঙ্গতরঙ্গে বালারুণ-রশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগর-জলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেত রেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।

যুগলাঙ্গুরীয়

২৭৩

দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কল কল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদী-জলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিম-গগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চন-কান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বর-প্রতিবিম্ব স্রোতস্বতী-জলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল; নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবরসকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল; দুর্গ-মধ্যে ময়ূর-সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল; কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বর-তলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল; আম্র-কানন দেখাইয়া আমোদর-স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় চারুবাস কম্পিত করিতেছিল।

দুর্গেশনন্দিনী

পরিশিষ্ট

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, কর্ম্ম ও সমকালীন ঘটনাবলী

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম—২৭ জুন, ১৮৩৮ (১১ আষাঢ়, ১২৪৫)

„ **মৃত্যু**—৪ এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৬ চৈত্র, ১৩০০)

জীবন-কাল —৫৫ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন

জীবন-অধ্যায় —(১) ১৮৩৮-১৮৫৮
(২) ১৮৫৮-১৮৭৬
(৩) ১৮৭৬-১৮৯৪

প্রথম অধ্যায়—শিক্ষা, বাল্য-রচনা, বিবাহ ও চাকরী-গ্রহণ

দ্বিতীয় অধ্যায়—পত্নী-বিয়োগ, দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ, সাহিত্য-সাধনা, মাতার মৃত্যু ও 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশ

তৃতীয় অধ্যায়—'বঙ্গদর্শনের বিদায়-গ্রহণ', পিতৃ-বিয়োগ, 'প্রচারে' ও 'নবজীবনে' ধর্ম্মালোচনা এবং কর্ম্ম হইতে অবসর-গ্রহণ

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৩১
	'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রথম প্রকাশ
	ডিরোজিও সাহেবের মৃত্যু
	১৮৩৩
	রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
	রামমোহন রায়ের মৃত্যু
	ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম
	১৮৩৪
	উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু
	১৮৩৫
	মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা
	ইংরেজি ভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্ত্তন
	শুর চার্লস্ মেট্‌কাফ-কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদান
	বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর জন্ম
	১৮৩৬
	'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি'র প্রতিষ্ঠা

জীবন, কর্ম্ম ও সমকালীন ঘটনাবলী

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৩৭
	ইংলণ্ডের সিংহাসনে ভিক্টোরিয়ার অধিরোহণ
	'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'-স্থাপন
১৮৩৮	১৮৩৮
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম	বাঙ্গালার আইন-আদালতে ফার্সী ভাষার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষার প্রচলন
	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
	কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম
	কৃষ্ণদাস পালের জন্ম
	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্ম (কবি)
	১৮৩৯
	রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু
	শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'সংবাদ-ভাস্করে'র প্রকাশ
	১৮৪০
	কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৪২
	শিক্ষা কৌন্সিল-স্থাপন
	ডেভিড্ হেয়ারের মৃত্যু
১৮৪৩	১৮৪৩
হাতে-খড়ি	'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ
	মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-গ্রহণ
১৮৪৪	১৮৪৪
মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি	গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম
	রামকমল সেনের মৃত্যু
	১৮৪৫
	রামদাস সেনের জন্ম
	১৮৪৬
	অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্ম
	নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম
	'নিত্য-ধর্ম্মানুরঞ্জিকা' পাক্ষিক পত্রের প্রকাশ
	১৮৪৭
	বিদ্যাসাগর-রচিত 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি'র প্রকাশ

জীবন, কর্ম্ম ও সমকালীন ঘটনাবলী

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৪৮
	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম
১৮৪৯	১৮৪৯
বিবাহ হুগলি কলেজে পাঠারম্ভ	বেথুন বিদ্যালয়-স্থাপন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
	১৮৫১
	রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র প্রকাশ অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' (১ম ভাগ) প্রকাশিত হয় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা
১৮৫২	১৮৫২
'সংবাদ প্রভাকরে' প্রথম পদ্যের প্রকাশ	নীলমণি বসাকের 'নবনারী'র প্রকাশ
১৮৫৩	১৮৫৩
সংস্কৃত সাহিত্য-অধ্যয়নে আত্ম-নিয়োগ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৫৩	
‘ললিতা—পুরাকালিক গল্প—তথা মানস’ লিখিত হইল	
১৮৫৪	১৮৫৪
জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার	রামনারায়ণের ‘কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব-নাটকে’র প্রকাশ তারাশঙ্করের ‘কাদম্বরী’র প্রকাশ ‘মাসিক পত্রিকা’র প্রকাশ
	১৮৫৫
	বিদ্যাসাগরের ‘শকুন্তলা’ ও ‘বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবে’র প্রকাশ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা সাঁওতাল-বিদ্রোহ দক্ষিণেশ্বরে ‘কালীবাড়ী’-স্থাপনা
১৮৫৬	১৮৫৬
‘ললিতা—পুরাকালিক গল্প—তথা মানস’ নামে পদ্য-পুস্তকের প্রকাশ সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার	বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয় ‘এডুকেশন গেজেটে’র প্রকাশ

জীবন, কর্ম্ম ও সমকালীন ঘটনাবলী

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৫৭	১৮৫৭
এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ	কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সিপাহি-বিদ্রোহ অগষ্ট্ কোম্তের মৃত্যু দাশরথি রায়ের মৃত্যু প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র পুস্তকাকারে প্রকাশ ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-প্রকাশ
১৮৫৮	১৮৫৮
বি. এ. পরীক্ষায় সাফল্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ —(প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর) 'Indian Field' নামক পত্রে 'Rajmohan's wife' নামে ইংরেজি উপন্যাসের ক্রম-প্রকাশ	দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোম-প্রকাশ' পত্রের প্রকাশ রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র প্রকাশ মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'র প্রকাশ মহারাণীর ঘোষণা-পত্র 'ইণ্ডিয়া কৌন্সিল'-স্থাপন
১৮৫৯	১৮৫৯
স্ত্রী-বিয়োগ	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামে প্রথম বাঙ্গালা প্রহসনের প্রকাশ

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৬০	১৮৬০
দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ	মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব-কাব্য'-প্রকাশ
	দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ
	১৮৬১
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
	মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-প্রকাশ
	হেমচন্দ্রের 'চিন্তা-তরঙ্গিণী'র প্রকাশ
	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
	কলিকাতায় হাইকোর্ট-স্থাপন
	১৮৬২
	স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
	কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র প্রকাশ
	বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'-প্রকাশ
	গোপীনাথ ঘোষের 'বিজয়-বল্লভ' উপন্যাসের প্রকাশ
	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'বিচিত্রবীর্য্য'-প্রকাশ

জীবন, কর্ম্ম ও সমকালীন ঘটনাবলী

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৬৩
	রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ' মাসিক পত্রের প্রকাশ
	দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী'র প্রকাশ
	'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সভা'র প্রতিষ্ঠা
	১৮৬৪
	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১৮৬৫	
'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ	
	১৮৬৬
	দীনবন্ধু-রচিত 'সধবার একাদশী'র প্রকাশ
১৮৬৭	১৮৬৭
'কপালকুণ্ডলা'র প্রকাশ	'অবোধ বন্ধু' পত্রের প্রকাশ
	কলিকাতায় 'হিন্দু মেলা'র অনুষ্ঠান
	১৮৬৮
	রামগোপাল ঘোষের মৃত্যু
	'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র প্রকাশ

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৬৯	১৮৬৯
বি. এল. পরীক্ষায় সাফল্য 'মৃণালিনী'র প্রকাশ 'বেথুন সোসাইটি'র অধিবেশনে 'হিন্দুর পূজোৎসবের উৎপত্তি-কথা' সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ	ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা
১৮৭০	১৮৭০
মাতৃ-বিয়োগ 'বেঙ্গল সোশ্যাল্ সায়ান্স এসোশিয়েশনে' 'বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য' বিষয়ক ইংরেজি প্রবন্ধ-পাঠ	কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম হরিশ মিত্রের 'মিত্রপ্রকাশ' মাসিক পত্রের প্রকাশ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজবালা' নামে উপন্যাসের প্রকাশ
	১৮৭১
	নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী'-প্রকাশ
১৮৭২-৭৩	১৮৭২
'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশ এই বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা'	সাধারণ বঙ্গ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক'-প্রকাশ

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৭২-৭৩	
প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া, তাঁহার 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞান-রহস্য', 'সাংখ্যদর্শন', 'বিবিধ সমালোচন' প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধ ইহাতে লিখিত হয়	
১৮৭৩	১৮৭৩
'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা'র পুস্তকাকারে প্রকাশ	মধুসূদন দত্তের মৃত্যু
'সাধারণী'তে 'জাতিবৈর' নামে প্রবন্ধের প্রকাশ	দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু
	জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু
	অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ
	রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'-প্রকাশ
১৮৭৩-৭৪	
দ্বিতীয় বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮০ সালের) 'যুগলাঙ্গুরীয়' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, এবং 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও	

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৭৩-৭৪	
‘সাম্য’ লিখিতে আরম্ভ করেন	
১৮৭৪	১৮৭৪
‘যুগলাঙ্গুরীয়’ ও ‘লোক-রহস্য’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়	‘ভ্রমর’ মাসিক পত্রের প্রকাশ সঞ্জীবচন্দ্রের ‘কণ্ঠমালা’ ইহাতে বাহির হইতে থাকে
‘ভ্রমর’ পত্রে ‘দুর্গাপূজা’ প্রবন্ধ-প্রকাশ	কালীপ্রসন্ন ঘোষের ‘বান্ধব’ পত্রের প্রকাশ
	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত ‘আর্য্যদর্শন’-প্রকাশ
	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বর্ণলতা’ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়
	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত ‘কল্পতরু’র প্রকাশ
	রাজনারায়ণ বসুর ‘সেকাল আর একাল’ গ্রন্থের প্রকাশ
১৮৭৪-৭৫	
তৃতীয় বর্ষের ‘বঙ্গদর্শনে’ (১২৮১ সালের) ‘চন্দ্রশেখর’-রচনা	

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৭৪-৭৫	
সমাপ্ত করেন এবং 'রজনী' লিখিতে আরম্ভ করেন	
১৮৭৫	১৮৭৫
'চন্দ্রশেখর' ও 'বিজ্ঞান-রহস্য' গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ	হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ
	নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রকাশ
	সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের যুবরাজ-রূপে ভারতে আগমন
১৮৭৫-৭৬	
চতুর্থ বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' 'রজনী' সমাপ্ত এবং 'রাধারাণী' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়	
পৌষ-সংখ্যা হইতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখিতে আরম্ভ করেন	
১৮৭৬	১৮৭৬
'বঙ্গদর্শনের বিদায়-গ্রহণ'	ভারত-সভা-সংস্থাপন
'কমলাকান্তের দপ্তর' (১ম ভাগ) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়	'সায়েন্স এসোশিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা
'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের প্রকাশ	চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রকাশ
দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী'-প্রকাশ	

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৭৭	১৮৭৭
'রজনী'র পুস্তকাকারে প্রকাশ 'উপকথা' (অর্থাৎ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী') প্রকাশিত হয়	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী (Empress of India) উপাধি-গ্রহণ 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ
১৮৭৮	১৮৭৮
'কবিতা-পুস্তক' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ	সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের 'কবি-কাহিনী'র প্রকাশ
১৮৭৯	
'প্রবন্ধ পুস্তক'-প্রকাশ	
১৮৮০	
সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত'-প্রকাশ	
১৮৮১	১৮৮১
পিতৃ-বিয়োগ সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' 'আনন্দমঠে'র রচনা আরম্ভ	গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধ' অভিনীত ও প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্ন হৃদয়' কাব্যের প্রকাশ

জীবন, কর্ম্ম ও সমকালীন ঘটনাবলী

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৮১
	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশ
	'বঙ্গবাসী' পত্রের প্রকাশ
১৮৮২	
হেষ্টি সাহেবের সহিত লেখনী-যুদ্ধে জয়	
'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ-দ্বয়ের প্রকাশ	
সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' 'দেবী চৌধুরাণী'র লেখা আরম্ভ	
১৮৮৩	১৮৮৩
'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' (১২৯০) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়	'ইলবার্ট বিলে'র প্রস্তাব
	'নব্য ভারত' মাসিক পত্রের প্রকাশ
	রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাত সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়
১৮৮৪	১৮৮৪
'নবজীবনে' 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র প্রবন্ধ-প্রকাশের আরম্ভ	অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবন' মাসিক-পত্রের প্রকাশ
'প্রচারে' 'সীতারাম' ও 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'র লেখা আরম্ভ	'প্রচার' মাসিকপত্রের প্রকাশ
	কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৮৪	১৮৮৪
'দেবী চৌধুরাণী' পুস্তক-প্রকাশ	গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য লীলা' নাটকের অভিনয় ও প্রকাশ
১৮৮৫	১৮৮৫
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন-চরিত'-প্রকাশ	'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসে'র প্রথম অধিবেশন ; উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ভিক্টর হুগোর মৃত্যু
১৮৮৬	১৮৮৬
'কৃষ্ণ চরিত্রে'র পুস্তকাকারে প্রকাশ 'প্রচারে' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাঙ্গালায় টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন	গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের অভিনয় ও প্রকাশ
১৮৮৭	১৮৮৭
'সীতারামে'র পুস্তকাকারে প্রকাশ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রকাশ	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব-কালের পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু

জীবন, কর্ম্ম ও সমকালীন ঘটনাবলী

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
১৮৮৮	
'ধর্ম্মতত্ত্বে'র গ্রন্থাকারে প্রকাশ	
১৮৮৯	১৮৮৯
বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু	গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' নাটকদ্বয়ের অভিনয় ও প্রকাশ
	১৮৯০
	'সাহিত্য' মাসিক পত্রের প্রকাশ
১৮৯১	১৮৯১
চাকরি হইতে অবসর-গ্রহণ	রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু
১৮৯২	
'রায় বাহাদুর' উপাধি-লাভ 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধ-প্রকাশ	
১৮৯৩	১৮৯৩
'সঞ্জীবনী সুধা'র সম্পাদন	চিকাগো নগরে 'Parliament of Religions' নামক সভার অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি-রূপে বক্তৃতা করেন

জীবনের ঘটনাবলী	সমকালীন ঘটনাবলী
	১৮৯৩
	গিরিশচন্দ্রের অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকের অভিনয় ও প্রকাশ
১৮৯৪	১৮৯৪
সি. আই. ই. উপাধি-লাভ	ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
	শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু	

১৩২২ সাল পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা

কালানুক্রমিক

বিষয়	লেখক	পত্র	প্রকাশ-কাল
দুর্গেশনন্দিনী		রহস্য সন্দর্ভ	সম্বৎ ১৯২১
দুর্গেশনন্দিনী		সংবাদ প্রভাকর	বঙ্গাব্দ ১২৭২
মৃণালিনী		রহস্য সন্দর্ভ	সম্বৎ ১৯২৭
লোকরহস্য		জ্ঞানাঙ্কুর	বঙ্গাব্দ ১২৮১
বঙ্গদর্শন	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	সাধারণী	,, ১২৮৪
বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বঙ্গদর্শন	,, ১২৮৫
মিরণ্ডা ও কপালকুণ্ডলা	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	,,	,, ১২৮৭
সাহিত্য সমালোচনা	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	সাধারণী	,, ১২৯০
আনন্দ মঠ	বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়	নব্যভারত	,, ১২৯০

বিষয়	লেখক	পত্র	প্রকাশ-কাল
চন্দ্রশেখর	লোকনাথ চক্রবর্ত্তী	”	বঙ্গাব্দ ১২৯০
দেবী চৌধুরাণী	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	পাক্ষিক সমালোচক	” ১২৯১
ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী	—	নবজীবন	” ১২৯২
বঙ্কিমচন্দ্র	অক্ষয়কুমার বড়াল	কল্পনা	” ১২৯৩
দুইটি হিন্দুপত্নী (ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী)		প্রচার	” ১২৯৫
কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতী	” ১২৯৫
দুর্গেশনন্দিনী		কল্পনা	” ১২৯৬
কপালকুণ্ডলা ও মিরণ্ডা	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাহিত্য	” ১২৯৮
সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী	”	”	” ”
রাজসিংহ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাধনা	” ১৩০০
বঙ্কিমচন্দ্র	”	”	” ১৩০১
কৃষ্ণ-চরিত্র	”		” ১৩০১
বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	”	” ১৩০১

সাময়িক পত্রে উল্লেখযোগ্য আলোচনা

বিষয়	লেখক	পত্র	প্রকাশ-কাল
বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য	রমেশচন্দ্র দত্ত	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা	১৩০১
বঙ্কিমচন্দ্র	দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	নব্যভারত	১৩০১
সমাজ সংস্কার ও স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র		জ্যোতিঃ	১৩০১
বাঙ্গালা ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান	কিশোরীমোহন রায়	ভারতী	১৩০২
বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র	চন্দ্রনাথ বসু	প্রদীপ	১৩০৫
ঐতিহাসিক চিত্র ও বঙ্কিমবাবু	সরলা দেবী	"	১৩০৬
বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	"	১৩০৬
বঙ্কিমচন্দ্র	কালীনাথ দত্ত	"	"
বঙ্কিমচন্দ্র		নবপ্রভা	১৩০৮
বঙ্কিমচন্দ্র	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	বঙ্গদর্শন	১৩১৩
আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম	জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়	"	"
বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বদেশী ভাব	"	"	"
বঙ্কিমবাবু ও স্বদেশী ভাব	"	"	"

বিষয়	লেখক	পত্র	প্রকাশ-কাল
বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম	প্রমথনাথ সেন	সাহিত্য	১৩১৩
কল্যাণী	"	"	"
বন্দেমাতরম্		"	"
গিরিজায়া	প্রমথনাথ সেন	"	১৩১৪
চন্দ্রশেখর চরিত্র	"	"	"
সত্যানন্দ	বীরেশ্বর গোস্বামী	"	"
ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	"	১৩১৫
আনন্দমঠ	মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন	১৩১৫
কপালকুণ্ডলা	গোলকবিহারী মুখোপাধ্যায়	"	"
কৃষ্ণকান্তের উইল	লোকনাথ চক্রবর্ত্তী	"	"
বন্দেমাতরম্	বিপিনচন্দ্র পাল	ধর্ম্ম	১৩১৬
বঙ্কিমচন্দ্র	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	সাহিত্য	১৩১৮
বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয় স্মৃতিকথা	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	"	১৩১৯

সাময়িক পত্রে উল্লেখযোগ্য আলোচনা

বিষয়	লেখক	পত্র	প্রকাশ-কাল
বঙ্কিমচন্দ্র	মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা	বিজয়া	১৩২১
বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	নারায়ণ	১৩২২
বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	”	”
সেকালের স্মৃতি	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	”	”
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	”	”
রজনী	—	”	”
বঙ্কিমবাবু	ললিতচন্দ্র মিত্র	”	”
ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	”	”
বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	”	”
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—গীতার কথা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	”	”
চরিত-চিত্র	বিপিনচন্দ্র পাল	”	”

ব